ছায়াবৃতা

CHAYABRITA

A Novel By : Subodh Ghose.

Price Rs. 2.50.

ছায়াবৃতা

সুবোধ ঘোষ

প্রাইমা পাবলিকেশন্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ

আষাঢ়, ১৩৬৮

প্রকাশক

নারায়ণ সেনগুপ্ত,

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ

গণেশ বসু

মুদ্রাকর

ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার,

শ্রীগোপাল প্রেস,

১২১, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

॥ দাম আড়াই টাকা ॥

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ভারত প্রেমকথা, কিংবদন্তীর দেশে, ফলিস, জতুগৃহ,
সুজাতা, শ্রেয়সী ইত্যাদি

ছায়াবৃতা

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না ঃ এই গানটি হলো এই ছোট শহরের প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত। তার মানে এই শহরের ছোট্ট একটি উৎসবের আসরে এই গানটি যেদিন গাওয়া হলো, তার আগে রবীন্দ্রনাথের আর কোন গান এই ছোট শহরের কোথাও কোন উৎসবে গাওয়া হয়েছে বলে কেউ মনে করতে পারে না।

কেউ মনে করতে পারে না বলেই অবশ্য ধারণাটা একেবারে নির্ভুল নয়। প্রতি বছর মাঘোৎসবের সময়ে সমাজবাড়িতে উপাসনার অনুষ্ঠানে দীননাথবাবু যে-সব গান গাইতেন, তার অনেকগুলিই তো রবীন্দ্রনাথের গান। কিন্তু বিমল আর অভয়, যারা দু'জন আজ এই ছোট শহরের জীবনে ওদের গানের গলার গুণে বিখ্যাত হয়েছে, তারাও বলবে, বাণীদির মুখেই আমরা প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেছিলাম। আর গানটা হলো এই গান—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়···।

শহরটা ছোট ; কিন্তু অনেক বড়-বড় জ্ঞানী আর গুণী মানুষ এ শহরে আসতেন আর চলে যেতেন। একবার এসেছিলেন কবি কামিনী রায়। সে-সময় এই ছোট শহরের মহিলাদের আর মেয়েদের জীবনে যেন একটা উৎসবের সাড়া জেগেছিল। কত বড় বিদুষী কবি, কী চমৎকার মুখশ্রী, আর কী সুন্দর কথা বলতে পারেন ; এহেন মানুষও বামাচরণবাবুর মত একজন মুহুরী মানুষের বাড়িতে এসে মেয়েদের সঙ্গে কত খুশি হয়ে কত কথা বললেন। এই ছোট শহরের সব মহিলার মন সেদিন যেন বেশ একটা গর্বে, সেই সঙ্গে বেশ একটা তৃপ্তিতেও ভরে গিয়েছিল।

কিন্তু একটা কথা বলে আক্ষেপ করেছিলেন বিদুষী কামিনী রায়—এ শহরের মেয়েরা লেখাপড়ায় এত পিছিয়ে আছে কেন ?

একদিন নিজেরই বাড়িতে শহরের সব মহিলা আর মেয়েদের একটা সভা ডেকে সবাইকে অনেক অনুরোধের কথা তিনি বলেছিলেন। শেষে বলেছিলেন—আর চার-পাঁচ বছর পরে এসে আমি যেন দেখতে পাই, এই শহরের একটি গ্র্যাজুয়েট মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমার আশা যেন বিফল না হয়।

চার-পাঁচটা বছর পার হয়ে গেলেও এই ছোট শহরে আর আসতে পারেননি বিদুষী কামিনী রায়। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে এই ছোট শহরের অনেক বাড়ির মহিলারা কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশা বিফল হয়নি। যদি বেঁচে থাকতেন তিনি, আর সেই পুরনো কথা স্মরণ করে সত্যি একবার এ-শহরে আসতে পারতেন, তবে তিনি এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ের সঙ্গে কথা বলে সুখী হতে পারতেন। তিনি দেখে বোধহয় একটু আশ্চর্যও হতেন ; ঐ যে সেই মেয়ে, মুহুরী মানুষ বামাচরণবাবুর যে মেয়েকে তিনি তাঁরই লেখা কবিতার বই 'গুঞ্জন' উপহার দিয়েছিলেন, সেই মেয়েটিই হলো এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। সেই মেয়েরই নাম বাণী। আজ বিমল আর অভয়কে জিজ্ঞেসা করলে ওরাও বলবে, হ্যাঁ, বাণীদিই হলেন আমাদের এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে।

বিমল এখনও মনে করতে পারে : পুলিশ ট্রেনিং কলেজের ময়দানটার কিনারা ধরে আরও কিছুদূর এগিয়ে যেয়ে, পোলো কটেজ নামে চমৎকার বাংলো বাড়ির ফটক পার হয়ে, মস্ত লিচু বাগানের পাশে যে হলদে রঙের বাড়িটার গা ঘেঁষে আজও ঝুমকো জবা আর সাদা গোলাপ ফুটে থাকে, সে বাড়িতে মা আর

কাকিমার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একদিন বিদুষী কামিনী রায়কে দেখেছিল বিমল। মনে আছে, লিচু আর চকোলেট উপহার দিয়েছিলেন কামিনী রায়।

আরও মনে পড়ে, সেদিন সেখানে বাণীদিকেও দেখতে পেয়েছিল বিমল। খুব সুন্দর সিল্কের একটা নতুন ফ্রক পরে বিদুষী কামিনী রায়ের গা ঘেঁষে বসে, আর একটা শ্লেট হাতে নিয়ে অঙ্ক করছিল সেদিনের সেই ছোট্ট বাণীদি।

বাড়ি ফেরবার সময় কাকিমার কাছে কথাটা বলেছিলেন মা, তাই কথাটাও আজও মনে আছে বিমলের ; বাণীকে ঐ নতুন ফ্রক কামিনী রায়ই উপহার দিয়েছিলেন।

এই বাণীদিকে আর-একটি ব্যাপারেও এই ছোট শহরের প্রথম মহিলা বলে মেনে নিতে পারা যায়। বসন্ত পঞ্চমীর দিনে এই ছোট শহরের ছোট ড্রামাটিক ক্লাব যে থিয়েটার করতো, সেই থিয়েটার দেখবার জন্য দর্শকদের জায়গাটা দুভাগে ভাগ করা থাকতো। একদিকে থাকতো চিক দিয়ে ঘেরা মেয়েদের জায়গা ; আর একদিকে পুরুষদের খোলা-মেলা জায়গা। বাণীদিই হলেন এই শহরের প্রথম মহিলা, যিনি চিকের বাইরে একটা টুলের উপর বসে থিয়েটার দেখতেন।

আজ থেকে অনেকদিন আগে এই ছোট শহরের ছোট স্কুলটার ছোট ময়দানের ঘাসের উপর বসে আর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে একদল খুশি পাখির কলরবের মত যে সব কথা বলে গল্প করতো বিমল অভয় নীহার আর শেখর, সে-সব কথা আজও ওরা বেশ স্পষ্ট ক'রে মনে করতে পারে ; কোন কথাই ওরা ভোলেনি। তার কারণ বোধহয় এই যে, কথাগুলি ভুলে যাবার মত নয়।

বিমল অভয় আর ওদেরই সমবয়সী বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে গল্প

ক'রে ক'রে খুবই খুশির একটা কথা আলোচনা করতো। খুব ভাল হয়, এই শহরের কোন বিদ্বানের সঙ্গে যদি বাণীদির বিয়ে হয়ে যায়। বাণীদির মত মেয়ের যদি অন্য শহরের কারও সঙ্গে বিয়ে হয়, তবে বাণীদিকে নিশ্চয় এ-শহর ছেড়ে দিয়ে সেই শহরে থাকতে হবে। এ-শহর তাহলে যে কানা হয়ে যাবে।

বাণীদি দেখতে চমৎকার; বাণীদি খুব ভাল করে লেখাপড়া শিখে বিদুষী হয়ে উঠছেন; নিশ্চয় বি-এ পাস করবেন বাণীদি। বাণীদি চমৎকার গান গাইতে পারেন, বাণীদি এ-শহরের সবচেয়ে সাহসী মেয়ে; চিকের বাইরে বসে থিয়েটার দেখেন। কোন সন্দেহ নেই, বাণীদি এ-শহর ছেড়ে চলে গেলে এ-শহরের গর্ব করবার কিছু থাকবে না।

॥ দুই ॥

মেয়েকে পড়াবার জন্য কী কষ্টই না স্বীকার করছেন বামাচরণ-বাবু। দীননাথবাবু জানেন, মেয়ের বই কেনবার জন্য টাকা যোগাড় করতে গিয়ে বামাচরণ একবেলা ভাত খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাণী মেয়েটাও বা কী কম কষ্ট করছে।

বিমলের মা জানেন, মেয়েটা বিছানার পুরনো ছেঁড়া চাদর কেটে আর শেলাই করে সায়া তৈরী করেছে আর সেই সায়া পরেছে। তবু নতুন সায়া কেনেনি। নতুন সায়া কেনবার পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনেছে।

কলকাতায় গিয়ে পরীক্ষা দিল বাণী ; আই এ পাসও করলো। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য ! এমন সময় মারা গেলেন বামাচরণবাবু। বি-এ পড়বার স্বপ্ন ছেড়ে দিল, আর একেবারে নীরব হয়ে গেল বাণী।

বিমলের মা তাই মাঝে মাঝে নীহারের মা'র কাছে আক্ষেপ করেন, বামাচরণবাবু সত্যিই একটা ভুল করে গেলেন। মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে এত চেষ্টা আর এত কষ্ট না করে যদি মেয়ের বিয়েটা দেবার জন্য একটু চেষ্টা আর একটু কষ্ট করতেন, তবে এতদিনে বিয়েটা হয়েই যেত নিশ্চয়। এখন কি উপায় হবে ?

নীহারের মা বলেন—বাণীর কলকাতার এক মাসী নাকি একটা সম্বন্ধ এনেছে। ছেলে বেশ ভাল সরকারী চাকরি করে।

বিমলের মা—জানি না। তবে খুব ভাল হয়, যদি বিয়েটা হয়ে যায়।

শেখরের মা হঠাৎ একদিন বলে ফেললেন—শৈলেশের সঙ্গেই কি বাণীর বিয়ে হবে ?

—কে বললে ?

শেখরের মা হেসে ফেললেন—কেউ বলেনি, কিন্তু আপনাদের বিমল আর অভয় একটা কথা বলছিল।

—কি কথা ?

—ওরা বলছিল, বাণীদির গান নাকি শৈলেশদার ভয়ংকর ভাল লেগে গিয়েছে।

বেশ বড় জমিদারী করেছিলেন, ওকালতী করেও অনেক টাকা উপায় করেছিলেন, এবং এ-শহরের সব চেয়ে বড় আর সুন্দর বাড়িটা যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি হলেন শৈলেশের বাবা মহিমবাবু। স্কুলটা মহিমবাবু অনেক টাকা খরচ করে স্থাপন করেছিলেন। এখনও যে স্কুলটা বেশ ভাল চলছে, সেটা মহিমবাবুরই একটা দানের দয়ার ফল। বিশ হাজার টাকার একটা ফণ্ড রেখে গিয়েছেন মহিমবাবু। তা ছাড়া গবর্নমেণ্ট আর জেলা বোর্ডও সাহায্য দেয়। তা ছাড়া, দরকার পড়লে শৈলেশও মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করে থাকে। প্রাইজের বই কেনবার সব টাকা, আর ফুটবল ও হকিস্টিক কেনবার সব টাকা শৈলেশই দিয়ে থাকে। স্কুলের সেক্রেটারি হয়ে শৈলেশ যেমন তার বাবার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তেমনই নিজেরও সুনাম বাড়িয়েছে। স্কুলটার জন্য মহিমবাবুর যেমন যত্ন ছিল, শৈলেশেরও প্রায় সেই রকমের যত্ন আছে। সেজন্য স্কুলটার দিন দিন উন্নতিও হয়ে চলেছে। স্কুলটা ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছে। বিমল নীহার শেখর অভয়, আর, আরও প্রায় কুড়িজন ছাত্র ক্লাস এইট পর্যন্ত উঠেছে। আর চারটি বছর লাগবে, ওরাই ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন হয়ে তার পর ক্লাস টুয়েলভ হয়ে যাবে। স্কুলটাও খাঁটি হাইস্কুল হয়ে যাবে।

কিন্তু সেকেণ্ড স্যার বুড়ো জলধরবাবু কাশীবাস করবার জন্য

হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলেন ; তাঁকে বিদায় অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে স্কুলেরই ছোট হলঘরের যে উৎসব হলো, সেই উৎসবে বাণী সেই প্রথম ঐ গানটা গেয়েছিল।—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না।

সে গান শুনে অক্ষয়বাবুর চোখ ছলছল করে।

হরেনবাবু বলেন—ঠিকই, আজকের অনুষ্ঠানের সেন্টিমেণ্ট ঠিক ধরতে পেরেছে বাণী। ঠিকই, বেচারা জলধরবাবুর দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় রইল না।

অক্ষয়বাবু—কি বললেন ?

হরেনবাবু—দিব্যি মাসে মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা পাচ্ছিলেন জলধর বাবু। একা মানুষের পেট চলেও যাচ্ছিল বেশ। এইবার বুঝবেন, কাজ ছেড়ে চলে যাবার ভুল হাড়ে হাড়ে টের পাবেন। কাশীতেও পয়সা খরচ করে ভাত পেতে হয় ; বাবা বিশ্বেশ্বর ঘরে ঘরে পরমান্ন পৌঁছে দেন না।

অক্ষয়বাবু—আমি অবিশ্যি একথা ভাবিনি।

হরেনবাবু—তবে কি-কথা ভাবলেন ?

অক্ষয়বাবু—আমি ভাবছি মেয়েটারই অদৃষ্টের কথা। আমার মনে হয়, বাণী আজ ওর বাবা বামাচরণের কথা মনে ক'রে এই গানটা গাইছে।

হরেনবাবু—তার মানে ?

অক্ষয়বাবু—জানেনই তো, বাণীকে বি-এ পাস করাবার জন্যে বামাচরণ কী কষ্টই না করতো। শীতের সময় একটা গরম চাদরও কিনতে পারেনি বামাচরণ, কারণ, মেয়ের আই-এ পরীক্ষার ফী দিতে গিয়ে টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটাও বি-এ পাশ করবে বলে কত আশা করেছিল। কিন্তু বৃথা ; আজ বামাচরণ নেই ;

বাণীও বি-এ পড়বার আশা ছেড়ে দিয়েছে। সত্যি, ভাবলে খুবই দুঃখ হয়। এতদিন কষ্টে ছিল, তবু একটা আশা নিয়ে মেয়েটার দিনগুলি সোনার খাঁচায়…।

হরেনবাবু জোরে একটা হাঁপ ছাড়েন।—তাই বলুন; আমি অবিশ্যি এদিকটা ভাবিনি।

অভয় ফিসফিস করে বিমলের কানের কাছে বলে—দেখছিস, বাণীদির চোখ দুটো কেমন চিকচিক করছে।

বিমল—দেখেছি; কিন্তু শৈলেশদা যে…।

অভয়—কি রে? কি রে?

বিমল—বাণীদির মুখের দিকে কেমন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন শৈলেশদা। অদ্ভুত।

অভয় বলে—সত্যি, কিন্তু কেন রে?

বিমল—বুঝতে পারছি না।

অভয়—বাণীদি দেখতে চমৎকার; তাই বোধহয়।

বিমল—না, সেজন্যে নয়। বাণীদির গানটা এত চমৎকার বলেই…।

অভয়—একই কথা।

শেখর আর নীহার এসে বলে—সেক্রেটারী শৈলেশদা কি বলেছেন, শুনেছিস?

অভয়—না।

শেখর—বাণীদির গানের মত চমৎকার গান শৈলেশদা জীবনে কোথাও শোনেননি।

বিমল—শৈলেশদা কাকে বললেন একথা?

নীহার—বাণীদিকেই বললেন।

অভয়—বাণীদি কি বললেন?

শেখর—বাণীদি চমকে উঠলেন।

বিমল—কোন কথা বললেন না ?

নীহার—না।

অভয়—যাক্‌গে।

বুড়ো জলধরবাবু তখন তাঁর গলার গন্ধরাজের মালাটাকে ছ'হাতে আঁকড়ে ধরে খুব ভাল একটা আশার কথা বলতে শুরু করেছেন।—আমি আশা করি, আমার জায়গায় যিনি আসবেন, তিনি আমার এইসব ছাত্রকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসবেন। তিনি যদি আমার মত বয়সের মানুষ হন, তবে তিনি যেন এই সব ছাত্রকে পুত্রবৎ মনে করে স্নেহ করেন। যদি, নবীন বয়সের কেউ আসেন, তবে, তিনি যেন এইসব ছাত্রকে ছোট ভাইয়ের দল বলে মনে করে ভালবাসেন।

অভয় হঠাৎ ব্যস্তস্বরে বলে ওঠে—ও ভদ্রলোক কে রে ?

বিমল—কোন্ ভদ্রলোক ?

অভয়—ঐ যে, দরজার ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে।

বিমল—কোথায় রে ?

অভয়—ঐ যে, হরেনবাবু আর অক্ষয়বাবুর চেয়ারের কাছে।

বিমল শেখর আর নীহার, তিনজনেই বলে—এ ভদ্রলোক নতুন এসেছেন বলে মনে হচ্ছে !

অভয়—ভদ্রলোককে এখানে নেমন্তন্ন করা হয়নি বোধহয়।

বিমল—বোধহয় কেন, নিশ্চয় নেমন্তন্ন করা হয়নি। তা না হলে কি দরজার কাছে ওভাবে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ?

অভয়—কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে বলবো ?

বিমল—বল।

অভয়—আমার মনে হয় ; বাণীদির গানটা এই ভদ্রলোকেরও খুব ভাল লেগে গিয়েছে।

বিমল—হতে পারে।

সেদিনের বিদায় সভা শেষ হলো। তার পরের দিন বুড়ো জলধর-বাবুও কাশী চলে গেলেন। আর ঠিক তার তিনদিন পরেই নতুন সেকেণ্ড স্যার হিস্ট্রি পড়াবার জন্য ক্লাস এইটের ঘরে এসে ঢুকলেন।

অভয় চমকে উঠে বিমলের গায়ে ঠেলা দেয়।—কি আশ্চর্য সেই ভদ্রলোক!

সেদিনই ক্লাসের ছুটির পর বাড়ি যাবার সময় শুনতে পায় অভয় আর বিমল, অঙ্কের স্যার দয়ালবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন হেড স্যার।—সেক্রেটারী কোথা থেকে খুব সস্তায় একটি সেকেণ্ড মাষ্টার এরই মধ্যে যোগাড় করে ফেলেছেন। বিজ্ঞাপন দেবার দরকার আর হলো না।

দয়ালবাবু—মাইনে কত ঠিক হলো?

হেড স্যার হেসে ফেলেন—ত্রিশ টাকা।

দয়ালবাবু—গ্র্যাজুয়েট নাকি?

হেড স্যার—হ্যাঁ।

দয়ালবাবু—কি আশ্চর্য!

হেড স্যার—আমিও তো বলছি, কি আশ্চর্য।

দয়ালবাবু—নামটা কি?

হেড স্যার—প্রকাশচন্দ্র বসু।

দয়ালবাবু—এতদিন কি করছিলেন, কোথায় ছিলেন?

হেড স্যার—শুনলাম, বর্মাতে একটা স্কুলে নাকি তু'বছর সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন।

দয়ালবাবু—ভাল।

॥ তিন ॥

খেলা শেষ হবার পর স্কুলের ছোট ময়দানের সবুজ ঘাসের উপর সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে বসে ওরা গল্প করে, বিমল অভয় শেখর আর নীহার: শৈলেশদার মত সেক্রেটারী না থাকলে স্কুলটার এত তাড়াতাড়ি এত উন্নতি হতো না ঠিকই, কিন্তু···।

—কিন্তু আবার কি ?

—কিন্তু ক্লাস এইটে কি এত ছাত্র হতো ? কখ্খনো না।

—কেন হতো না ?

—অর্ধেক ছেলে মিশন হাইস্কুলে চলে যেত। ভাগ্যিস প্রকাশদা সেকেণ্ড স্যার হয়ে এসেছিলেন।

—তা বটে।

—প্রকাশদার মত বিদ্বান মানুষ সেকেণ্ড স্যার হয়েছেন, আর এত চমৎকার পড়াচ্ছেন, তাই না এত ছেলে এসে আমাদের স্কুলে ভিড় করেছে।

—প্রকাশদা কিন্তু এম-এ নন। শুধু বি-এ।

—তাতে কি আসে যায় ? হেড স্যার রাখালবাবুর মত বি-একে শিখিয়ে দিতে পারেন প্রকাশদা।

—সত্যি ; হেড স্যার নিজেও একদিন প্রকাশদার কাছে কথাটা বলছিলেন।

—কি বলছিলেন ?

—বলছিলেন, তুমি কাছে থাকলে আমার আর ডিক্‌সনারি দরকার হয় না হে প্রকাশ।

আগে হেড স্যার রাখালবাবু যেমন স্কুলের অফিস-ঘরে, তেমনি

পড়াবার ক্লাসে কেমন যেন মনমরা হয়ে থাকতেন। মুখের চেহারাটাও বেশ উদ্বিগ্ন দেখাতো! আর হাতের কাছে সব সময় থাকতো একটা ইংরেজী ডিকসনারি। স্কুল ইনস্পেক্টরের কোন চিঠি হোক, কিংবা ব্যাঙ্কের কোন চিঠি হোক, পড়তে গিয়ে তিনবার চশমা মুছতেন হেড স্যার। আর, বার বার ডিকসনারি খুলতেন। কপালটাও যেন দুশ্চিন্তার ভারে কুঁচকে যেত।

ক্লাসে পড়াতে এসেও হেড স্যার ভুঁরু কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাতেন। ইংরেজী পোয়েট্রি হোক, আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি হোক, দুইই যেন হেড স্যারের কাছে সমান বিস্বাদের দুটো বস্তু, দুটো নিমতেতো ওষুধ। বই খুলে এক লাইন পাঠ করেই দু'বার ডিকসনারি খুলতেন হেড স্যার। ভাবতেন, ঘাড়ের উপর হাত বোলাতেন। তারপরেই বেশ জোরে, যেন বেশ একটু ক্ষিপ্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠতেন—টেল মি নট ইন মোর্ণফুল নাম্বার্স! ভেরি ইমপর্টেণ্ট। আণ্ডারলাইন ইট। লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডার লাইন কর।

এইভাবেই ইংরেজী পোয়েট্রি পড়াতেন হেড স্যার রাখালবাবু। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রিও এইভাবে। লাল পেন্সিল দিয়ে আণ্ডারলাইন করে করে ছাত্রদের ইংরেজী পোয়েট্রির আর ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রির বই দুটো রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল।

প্রকাশ আসবার পর হেড স্যার রাখালবাবুর মুখে হাসি ফুটেছে। ক্লাসে পড়ানো প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন হেড স্যার রাখাল বাবু। ক্লাস এইটের ইংরেজী আর হিস্ট্রি পড়াবার দায়িত্ব সেকেণ্ড স্যার প্রকাশই খুসি হয়ে নিয়েছে। বিমল আর অভয় মাঝে মাঝে হাঁপ ছেড়ে আলোচনা করে—যাক্ আণ্ডারলাইনের মার থেকে বইগুলো খুব বেঁচে গেল।

থার্ড স্যার, ফোর্থ স্যার আর পণ্ডিত মশাই আড়ালে আড়ালে হাসেন আর গল্প করেন।—হেড কিন্তু বুঝতে পারছেন না।

—কি?

—তাঁহাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

—তার মানে?

—হেডকে শিগগির বোধহয় বেহেড হতে হবে। আর প্রকাশই হেড হয়ে··· !

—আরে না না; প্রকাশ নিতান্ত টেম্পোরারী। প্রকাশের ফিউচার সুবিধের নয়।

—কিন্তু এটা কেমনতর হলো? সেক্রেটারী তো সবই দেখছেন আর বুঝছেন, তবু প্রকাশকে টেম্পোরারি করে রেখেছেন কেন?

—বুঝতে পারি না মশাই।

—সেই জন্যেই বোধহয় রাখালবাবু এত নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন।

—তাই তো মনে হয়।

—আর প্রকাশের মতিগতিও তো ঠিক বোঝা যায় না। হেড যে ওরই ঘাড়ে কাঁঠাল ভেঙ্গে এত সুখ করছেন, তবু প্রকাশের মনে যেন কোন জ্বালা নেই।

—না, তা নেই। বরং কেমন যেন একটা উপেক্ষা আছে।

—হ্যাঁ, আমিও এদিকে-ওদিকে খোঁজ করে জেনেছি, একদিনের জন্যেও সেক্রেটারীর কাছে গিয়ে প্রকাশ একটা মুখের কথাও বলেনি যে, মাইনে বাড়িয়ে দিন কিংবা পার্মানেণ্ট করুন।

—কিন্তু সেক্রেটারীর নিজের থেকেই একটু সুবিচার করা উচিত ছিল। কে না জানে, প্রকাশের পড়াবার সুনামের জন্যেই স্কুলের ছাত্র বেড়ে চলেছে।

—প্রকাশের মতিগতির রকমটাও তো বোঝা যায় না। যখন বুঝছে যে, উন্নতির বিশেষ কোন সুযোগ নেই, তখন এমন মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলেই তো পারে।

—হ্যাঁ, আমাদের না হয় মেঘে মেঘে অনেক বেলা হয়েছে; বয়সের গাছপাথর পেকে গেছে। কিন্তু প্রকাশ তো বলতে গেলে নিতান্ত কাঁচা বয়সের একটা ছেলে।

—কত বয়স হবে প্রকাশের, আন্দাজ?

—ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

—আমাদের সেক্রেটারী শৈলেশও তো…।

—সেক্রেটারীও প্রায় তাই। এই তো বছর পাঁচ হলো বি-এ বি-এল হয়েছেন।

—সেক্রেটারী কিন্তু প্রকাশকে বিদ্যের কেষ্টবিষ্টু বলে মনে করে না।

—কেমন ক'রে বুঝলেন?

—সেক্রেটারী শৈলেন্দ্র নিজেই কথাটা বলছিল; বেশ গম্ভীর হয়ে আর চোখ পাকিয়ে, অথচ মুখ টিপে যেন একটা অবজ্ঞার হাসি চেপে রেখে…।

—শৈলেশ কি বললে, সেটা আগে বলুন।

—বললে, প্রকাশ মাষ্টার পড়ায় ভাল; কিন্তু পেটে বিদ্যে-টিদ্যে কিছু নেই।

॥ চার ॥

বিখ্যাত থিয়সফিস্ট জিনরাজ দাস এসেছেন ; আর ধর্মের কথা নিয়ে এই ছোট শহরের মুখে আর মনে যেন একটা তর্কের তুফান চলছে। শহরটা ছোট, কিন্তু এই তুফানটা ছোট নয়। বার লাইব্রেরীর ঘরেও তর্কের লড়াই প্রবল হয়ে ওঠে।

অগত্যা একদিন সম্মুখ সমরের মত একটা কাণ্ড বাধাবার ব্যবস্থা করলেন স্বয়ং জিনরাজ দাস। প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে একটা জনসভা ডাকা হবে। জিনরাজ দাস থিয়সফির পক্ষে বলবেন। আর, যাঁর ইচ্ছে হবে তিনিই তাঁর ধর্মের পক্ষে বক্তৃতা করবেন।

প্রসাদ মেমোরিয়াল হল সেদিন মানুষের ভিড়ে ভরে গিয়েছিল। সব চেয়ে জোরালো বক্তৃতা দিলেন স্বয়ং জিনরাজ দাস। জেস্যুইট মিশনের ফাদারও কম যান না। দীননাথবাবুও চমৎকার বললেন। উকীল মণ্টুবাবু নাস্তিকতার পক্ষে বললেন। কিন্তু বক্তৃতাগুলি যেন তপ্ত ভাষার এক-একটা হল্‌কা। সভায় গোলমাল বাড়ে, কথা কাটাকাটি হয়, শ্রোতাদের মধ্যে কেউ-কেউ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হৈ-হৈ করে ওঠেন। বার দুই শেম-শেম ধ্বনিও বেজে ওঠে।

হঠাৎ প্রকাশ মাস্টারকে দেখতে পেয়ে দীননাথবাবু ডাক দিলেন, বক্তৃতা করতে বললেন।—যদি পার; তবে তুমি কিছু বল প্রকাশ। ছেলেরা তো বলে, তুমি নাকি খুব ভাল বলতে পার।

পুরো আধ-ঘণ্টা ধরে ইংরেজী ভাষাতেই বক্তৃতা দিল প্রকাশ মাস্টার।

প্রসাদ মেমোরিয়াল হলের এতক্ষণের এত উত্তেজিত শ্রোতার ভিড় শান্ত হয়ে প্রকাশ মাস্টারের বক্তৃতা শুনলো। আসল

কথা হলো, প্রকাশ মাস্টারের বক্তৃতা শুনেই শ্রোতারা শান্ত হয়ে গেল। জেস্যুইট মিশনের সাহেব স্নিগ্ধভাবে হাসলেন। মণ্টু উকীল একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আর, জিনরাজ দাস জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

সভা ভাঙ্গবার পর স্কুল-সেক্রেটারী শৈলেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ মাস্টারের মুখটার দিকে অদ্ভুত ভাবে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে। আর, বিমল অভয় নীহার আর শেখর ওদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে বলাবলি করে ঃ

—বাবার কাছে গল্প শুনেছি।

—কি ?

—অনেকদিন আগে ঠিক এরকম একটা চমৎকার কীর্তি করেছিলেন···।

—কে ?

—স্বামী বিবেকানন্দ।

—কোথায় ?

—চিকাগোতে।

—কোথায় ?

—আমেরিকাতে।

টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা তাঁদের মেসবাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আর তামাকের ধোঁয়ায় সেই অন্ধকারকে আরও ঘন করে দিয়ে যে-সব কথা আলোচনা করেন, তাতেও বোঝা যায় যে, তাঁরাও একটা ঘটনার ধাঁধার সমাধান করতে পারছেন না। সেকেণ্ড মাস্টার প্রকাশ এই বয়সেই এত অসাধারণ রকমের যোগ্যতার আর বিদ্যার মানুষ হয়েও ত্রিশ টাকার মাইনেতে এখানে পড়ে আছে। এ মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার

কোন লক্ষণও প্রকাশের কথায় বা ব্যবহারে দেখা যায় না। সেক্রেটারী শৈলেশও প্রকাশকে এইবার ঠিক বুঝতে পেরেছে। প্রকাশের সেদিনের বক্তৃতা শৈলেশও শুনেছে; অথচ প্রকাশের জন্য পাঁচ টাকা মাইনে বৃদ্ধির একটা অর্ডার লিখতেও সেক্রেটারীর কলমে কালি সরে না। যেন কঠোর রকমের একটা অনিচ্ছা আর আপত্তি আছে সেক্রেটারীর। মুখে না বললেও সেটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্যাপারটা বেশ জটিল একটা ধাঁধা বলেই তো মনে হয়।

॥ পাঁচ ॥

এই প্রকাশও যেন একটা ধাঁধা। এ সহরে কবে এসেছিল প্রকাশ, কতদিন ধরে এখানে ছিল, সেখবর কেউ জানে না। স্কুলের টিচারদের সবাই শুধু এই সত্যটুকু জানতে পেরেছেন যে, খবরটা হেড মাস্টার রাখালবাবু নিজেই জানিয়েছিলেন, যে-সন্ধ্যায় বুড়ো জলধর-বাবুর বিদায় সভা সাঙ্গ হলো, সেই সন্ধ্যাতেই সোজা সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়িতে গিয়ে আর শৈলেশের সঙ্গে দেখা করে, শৈলেশেরই হাতে একটা দরখাস্ত তুলে দিয়েছিল প্রকাশ। সেকেণ্ড মাস্টারের কাজটা পেতে চায় প্রকাশ; মাইনে যা উচিত বলে মনে করবেন সেক্রেটারী, প্রকাশও সেই মাইনে খুশি হয়ে মেনে নেবে।

সেক্রেটারী শৈলেশও দরখাস্ত পড়ে খুশি হয়েছিল। একজন বি-এ পাস অভিজ্ঞ টিচার; বর্মাতে যে চার বছর হাইস্কুলে পড়িয়েছে, তাকে এখানে এই স্কুলের জন্য পঞ্চাশ টাকাতে নিয়ে নিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু মাইনের পরিমাণ নিয়ে প্রকাশবাবুর কোন দাবির জেদ নেই। শৈলেশ জিজ্ঞাসা করেছিল—ত্রিশ টাকাতে রাজি আছেন?

প্রকাশ—হ্যাঁ।

শৈলেশ—তবে কাল বাদে পরশু থেকেই পড়াতে শুরু করুন।

প্রকাশ—বেশ।

শৈলেশ—কাজটা টেম্পোরারি কিন্তু।

প্রকাশ—বেশ।

অল্প কথা বলে, কথা বলবার ভঙ্গীটাও নম্র, আর স্বভাবটাও

খুবই শান্ত বলে মনে হয়, এই প্রকাশ যে সত্যই এত ভাল শিক্ষিত একটি মানুষ, এটা অবশ্য হেড মাস্টার রাখালবাবু আর টিচারেরা কল্পনাও করতে পারেননি। সেদিন তাই এমন কিছু আশ্চর্য কেউ হয়নি, কিন্তু এখন ভাবতে সত্যিই বেশ আশ্চর্য বোধহয়। এধরণের ত্রিশ টাকা মাইনের একটা মাস্টারীর কাজ নিতে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো কেন প্রকাশ ?

স্কুলের মাঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে গল্প করতে গিয়ে নীহার আর শেখরও আশ্চর্য হয়।—সত্যি, প্রকাশদা যেন হাওয়ার ভেতর থেকে বের হয়ে এসে···।

বিমল—কি ?

নীহার—সেকেণ্ড স্যার হয়ে গেলেন।

অভয় হাসে—বাণীদির গানের জন্য নয় তো ?

বিমল—তার মানে !

অভয়—মানে আবার কি বলবো ? এর মানে হয় না। যদি বুঝতে না পারিস, তবে বুঝিস না।

শেখর—তুই বলতে চাস, বাণীদির গান শুনে প্রকাশদা···।

অভয়—আমি কিছুই বলছি না।

বিমল—সাহস করে প্রকাশদাকে একবার জিজ্ঞাসা করলেই তো হয়।

অভয়—আমার সাহস আছে।

নীহার—তবে চল, জিজ্ঞেস করি।

প্রকাশ মাস্টার, যে মানুষটি এত শান্ত, এত কম কথা বলে আর আড়ালে পড়ে থাকতে ও পাশ কাটিয়ে চলে যেতে এত ভালবাসে, সে মানুষ কিন্তু টাউনের একটা ভিড়ভরা সরু রাস্তার পাশে ছোট একটা ঘরের মধ্যে থাকে। কে জানে কোন্ হোটেলে খাওয়া-

দাওয়া করে প্রকাশ মাস্টার? এই সরু সড়কের উপর হৈ-চৈ আর চিৎকার যেন অবিরাম ছুটোছুটি করছে। এরই মধ্যে প্রকাশ মাস্টারের ছোট্ট ঘরটা যেন একটা গোপন নীরবতা।

অভয় আর নীহার এগিয়ে যেয়ে ঘরের দরজায় ঠেলা দেয়; ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে। কিন্তু প্রকাশ মাস্টার নেই। কে জানে এরকম সন্ধ্যার সময়ে কোথায় আর কোন্ দিকে ঘুরে বেড়ায় প্রকাশ মাস্টার?

বিমল বলে—প্রকাশদা বোধহয় টিউশনী ধরেছেন।

অভয়—না।

বিমল—কেমন করে বুঝলি?

অভয়—আমার তাই মনে হচ্ছে।

শেখর—কেন?

অভয়—প্রকাশদাকে বাবা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমাকে পড়াতে পারবেন কি না?

নীহার—কি বললেন প্রকাশদা?

অভয়—একটা আশ্চর্য কথা বললেন।

শেখর—কি?

অভয়—বললেন, প্রাইভেট পড়াতে হলে তাঁর পক্ষে কলেজের পরীক্ষার কোন ছাত্র হলেই ভাল হয়।

বিমল—ছাত্র?

অভয়—হ্যাঁ।

নীহার—ছাত্রী বলেননি তো।

অভয়—মনে মনে কি বলেছেন জানি না; তবে মুখে তো শুধু ছাত্র বললেন।

শেখর—মুখ টিপে হাসছিস কেন?

অভয়—তুইও তো মুখ টিপে হাসছিস।

বিমল—তাহলে প্রকাশদা কি এখন···।

অভয়—চল তবে; একবার খোঁজ নিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসি, সত্যিই প্রকাশদা কোন ছাত্রীকে পড়াতে শুরু করেছেন কিনা।

প্রকাশ মাস্টারের ঘরের দরজা আবার ঠেলা দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে চারটে কৌতূহলের মূর্তি সরে যায়। সরু সড়কের ভিড় পার হয়ে, টাউনের চকের কাছে এসে ডান দিকে ঘুরে একটা নিরালা পথের আলো-ছায়ার ভিতর দিয়ে ওরা চলতে থাকে।

কৌতূহলের মূর্তি বটে, কিন্তু ওরা চারজন যেন চারটে নিদারুণ তদন্তের মূর্তি। তা না হলে, ওদের মনে এমন অদ্ভুত ধারণা কেন হবে যে, এই সন্ধ্যায় প্রকাশ মাস্টার হয়তো ওদের বাণীদির বাড়িতে একটি ঘরের মধ্যে বসে, আর বাণীদিরই সুন্দর মুখটার দিকে তাকিয়ে কলেজের পরীক্ষার পড়া পড়িয়ে চলেছেন?

না, নিতান্ত ভুল ধারণা আর মিথ্যে সন্দেহ। বামাচরণবাবুর সেই সামান্য চেহারার বাড়িটার সামনে সেই টক পেয়ারার গাছটা শুধু অন্ধকারে দুলছে। বাড়িটা যেন এখনও বামাচরণবাবুর হঠাৎ মৃত্যুর ব্যথাটাকে গায়ে মেখে আর বিষণ্ণ হয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে; বাড়ির কোন ঘরের ভিতরে আলো আছে বলে মনে হয় না।

ঠিকই, সত্যিই তো বাণীদি চুপটি করে আর একলাটি হয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আছেন, আর সন্ধ্যার আকাশের তারাগুলিকে দেখছেন।

বামাচরণবাবুর এই বাড়িতে বাণী অবশ্য একেবারে একলাটি হয়ে যায় নি। বাণীর এক পিসি আছেন, বামাচরণবাবুর মৃত্যুর পর দুম্‌কা থেকে এসে এই পিসি আজও এখানেই আছেন। বিমলের

মা'র কাছে এসে বলে গিয়েছেন পিসি—মেয়েটার একটা গতি হয়ে গেলেই তিনি আবার ভূম্‌কা ফিরে যাবেন। আর, সত্যিই যদি এক বছরের মধ্যেও কোন গতি না হয়, বাণীর মন্টুমাসী যদি কলকাতার পাত্রটিকে হাতছাড়া করেন, তবে বাণীকেও সঙ্গে নিয়ে তিনি ভূম্‌কা চলে যাবেন।

অভয় আর বিমল বারান্দার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। বাণী বলে—কে ?

অভয়—আমরা।

বাণী—অভয় ?

অভয়—হ্যাঁ, বাণীদি।

বাণী—কি ব্যাপার ?

অভয়—এই···হঠাৎ এদিকে চলে এলাম।

বাণী হাসে—এখন তো টক পেয়ারার সীজন্‌ নয়।

অভয়—ছিঃ, বাণীদি, আপনি আমাদের এত লোভী বলে সন্দেহ করেন ?

বাণীও হাসে—সন্দেহ করি না ; বিশ্বাস করি।

অভয়—তা হলে আমরাও আপনাকে সন্দেহ করতে পারি।

বাণী—কি সন্দেহ ?

অভয়—এই যে, আপনি এই সন্ধ্যার সময় এরকম গম্ভীর হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা দেখছেন, কেন ?

বাণী—ঠিকই, কিছু ভাল লাগছে না ভাই।

বিমল—আপনি কি পড়া-টড়া ছেড়ে দিয়েছেন ?

বাণী—হ্যাঁ।

শেখর—বি-এ পরীক্ষা দেবেন না ?

বাণী—না।

নীহার—এটা কিন্তু ভাল করলেন না বাণীদি। আমরা যে আশা করেছি, আপনি হবেন আমাদের টাউনের ফার্স্ট মহিলা গ্র্যাজুয়েট।

বাণী—তোমাদের আশা মিথ্যে হয়ে গেল।

অভয়—আমার বিশ্বাস, আমাদের আশা সত্যি হবেই হবে।

বাণী হাসে—হোক্ তবে।

অভয়—আচ্ছা, আজ তবে আসি, বাণীদি।

বাণী—এস।

না, প্রকাশদা এখানে আসে নি। প্রকাশদাকে সন্দেহ করা খুবই ভুল হয়েছে। বাণীদির গান যদিও-বা প্রকাশদার ভাল লেগে থাকে, কিন্তু বাণীদিকে পড়াতেও প্রকাশদার ভাল লাগবে, এমন কোন কথা নেই। আজ এই সন্ধ্যায় প্রকাশদা হয় তো এই টাউনের অন্য কোন রাস্তায় শুধু নিজের খামখেয়ালী ইচ্ছার টানে একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু, কি আশ্চর্য ; এই সন্দেহটাও নিতান্ত ভুল একটা সন্দেহ। বামাচরণবাবুর সেই সামান্য চেহারার বাড়ির ফটক থেকে সরে এসে আর, মাত্র পাঁচ মিনিট হেঁটে এগিয়ে যেতেই অভয়ের চোখে একটা বিস্ময়ের দৃশ্য চমকে ওঠে।—ও কে রে? প্রকাশদা বলেই তো মনে হচ্ছে।

ফুলের টব দিয়ে সাজানো বারান্দা, আর বাঁশের জাফরিতে লতা ওঠানো, ঐ বাড়িটা হলো নন্দী সাহেবের বাড়ি। বুড়ো মানুষ নন্দী সাহেব পুরু কাচের চশমা চোখে দিয়ে সারাদিন তাঁর লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে বসে থাকেন। শুধু বই আর বই, নানা বিদ্যার অজস্র বই লাইব্রেরী ঘরের পনরটা আলমারিতে সাজানো রয়েছে। কিন্তু কথাটা সকলেই জানে। নন্দী সাহেবের চোখে পুরু কাচের চশমার কোন অর্থ হয় না। তিনি চোখে দেখতেই পান না। এই তো,

মাত্র এক মাস হলো এই সহরে এসেছেন নন্দী সাহেব। তিনি নাকি চল্লিশ বছর আফ্রিকার একটা দেশের কলেজে প্রফেসর ছিলেন। এই বাড়িটা আগে ছিল লুথারবাবুর বাড়ি। নন্দী সাহেবের কাছে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে লুথারবাবু তাঁর ছেলের কাছে কলম্বোতে চলে গিয়েছেন।

কিন্তু অন্ধ নন্দী সাহেবের বাড়িতে প্রকাশ মাস্টারের কি কাজ থাকতে পারে?

নন্দী সাহেবের বাড়ির বারান্দা থেকে নেমে প্রকাশ মাস্টার ফটকের দিকেই এগিয়ে আসছে। বোধহয় বাড়ি ফিরে যাচ্ছে প্রকাশ মাস্টার। অভয় আর নীহার, শেখর আর বিমল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রকাশ মাস্টার আরও এগিয়ে এসে সড়কের উপর পা দিতেই অভয় চেঁচিয়ে উঠে।—আমরা আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম স্যার।

প্রকাশ—কেন?

বিমল—এমনিই···তার মানে···।

অভয়—জানতুম না, আপনি এখন এখানে নন্দী সাহেবের বাড়িতে আছেন।

প্রকাশ—আমি আজকাল রোজই সন্ধ্যায় এখানে আসি।

অভয়—কেন স্যার?

প্রকাশ—পড়তে আসি। এখানে অনেক বই আছে।

শেখর—আপনি তো যথেষ্ট বিদ্বান, তবু আরও বই পড়বার কি দরকার ছিল স্যার?

প্রকাশ হেসে ফেলে—দরকার ছিল।

অভয়—আপনি কি এম-এ পরীক্ষা দেবেন স্যার?

প্রকাশ—না।

বিমল—তবে কেন স্যার···।

প্রকাশ—ধর, যদি কোনদিন বি-এ ক্লাসের কাউকে পড়াতে হয়, তখন তো সামান্য বিদ্যাতে কুলিয়ে উঠতে পারবো না।

নীহার—কী বলছেন স্যার? আপনি তো বিবেকানন্দের মত ইংরেজী বক্তৃতা দিতে পারেন, বি-এ টি-এর বিদ্যে তো আপনার কাছে একেবারে জলের মত সহজ।

প্রকাশ—না, তা নয়। আমি হিস্ট্রি আর সাহিত্য ভাল জানি না।

শেখর—বললে বিশ্বাস করবো কেন স্যার। আপনি কী চমৎকার হিস্ট্রি আর পোয়েট্রি পড়ান, সেটা সকলেই জানে।

প্রকাশ—তোমাদের হিস্ট্রি আর পোয়েট্রি, আর বি-এর হিস্ট্রি আর পোয়েট্রি এক নয়।

অভয়—আপনি নিশ্চয় ধর্মের সাবজেক্ট খুব ভাল জানেন।

প্রকাশ—কে বললে?

অভয়—কেউ বলেনি। আমাদের তাই মনে হয়েছে। তা না হলে আপনি সেদিন ধর্মের বক্তৃতাতে সকলকে এত আশ্চর্য করে দিলেন কেমন করে?

প্রকাশ—হ্যাঁ, একটু সুবিধে ছিল। অনেকদিন আগে, বর্মাতে থাকতে···।

হঠাৎ চুপ হয়ে যায় প্রকাশ মাস্টার। যেন নিজের মনের একটা অসাবধান মুহূর্তে হঠাৎ একটু বেশি মুখরতা করে ফেলেছে প্রকাশ মাস্টার।

অভয়—বর্মাতে থাকতে কি হয়েছিল স্যার?

প্রকাশ বিড়বিড় করে—কিছুই না; সেটা বলবার মত এমন কিছু ব্যাপার নয়।

নীহার—বলুন না স্যার।

অভয়—বর্মাতে আমি এক পাদরী সাহেবের বাড়িতে কাজ করতাম। প্রায় আট বছর কাজ করেছি। সাহেবের বাড়িতে আলমারি ভর্তি অনেক বই ছিল। কাজ সারা হয়ে যাবার পর বই পড়তাম। সবই ধর্মের বই, তাই ধর্মের সাবজেক্টে···।

বলতে বলতে আবার কথার আবেগ হঠাৎ স্তব্ধ করে দিয়ে হেসে ওঠে প্রকাশ মাস্টার। —যাক্ গে, সে-সব কথা শুনে তোমাদের কোন লাভ নেই।

অভয়—বর্মার স্কুলটা কেমন ছিল স্যার? খুব বড় স্কুল নিশ্চয়।

প্রকাশ—কিসের স্কুল?

অভয়—যে-স্কুলে আপনি অনেক বছর পড়িয়েছিলেন।

দূরের লাইট পোস্টটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে প্রকাশ মাস্টার। —হ্যাঁ মন্দ নয়···স্কুলটা ভালই ছিল··· তোমরা বাড়ি যাও এবার।

ব্যস্তভাবে চলে যায় প্রকাশ মাস্টার।

॥ ছয় ॥

সেদিন যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ির বারান্দার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে ছিল বাণী ; তার কদিন পরের একটি দিনে, আবার ঐরকমই একটি সন্ধ্যায় বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে আকাশের তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু আজকের সন্ধ্যার তারাগুলি যেন একগাদা ঝিকিমিকি বিস্ময়। এ কী অদ্ভুত কথা বললেন নন্দীসাহেব।

লোক পাঠিয়ে বাণীকে ডেকেছিলেন অন্ধ নন্দী সাহেব। লোকের হাতে একটা চিঠিও দিয়েছিলেন—আমি তোমাকে একবার দেখতে চাই।

কি আশ্চর্য, অন্ধ মানুষ আবার কী দেখবেন ? মনে হয় কোন কথা বলতে চান। যেতে অনিচ্ছা ছিল, তবু গিয়েছিল বাণী।

নন্দী সাহেব বললেন—আমি শুনেছি, আমার চাকর রামদীনের কাছে সবই শুনেছি। তোমার বাবা বেঁচে নেই। দুঃখের কথা। কিন্তু আমারও যে মেয়েটি বেঁচে নেই।

ফুঁপিয়ে উঠলেন অন্ধ নন্দী সাহেব।

বাণী বলে—দুঃখ করবেন না।

হেসে ফেলেন নন্দী সাহেব—ঠিক কথা। দুঃখ করতে চাই না। …যাই হোক্, শুনেছি, তুমি নাকি বি-এ পড়তে চেয়েছিলে ?

বাণী—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি একথা কোথায় শুনলেন ?

নন্দী সাহেব—একটি ছেলে বললে ; ছেলেটিকে খুবই ভাল ছেলে বলে মনে হলো।

বাণী ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে—নাম ?

নন্দী সাহেব—নামটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নি। যাই হোক্, নামটা না হয় তুমি জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও। কথা হলো, ছেলেটি তোমাকে পড়াতে রাজি আছে। পড়াবার জন্যে টাকা-পয়সার কোন দাবি তার নেই। তার ইচ্ছে, তুমি বি-এ পাশ কর। তার বিশ্বাস, সে তোমাকে পড়ালে তুমি বি-এ পাশ করবেই।

বাণীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়—অদ্ভুত কথা!

নন্দী সাহেব—অদ্ভুত কেন? তোমারই কথাটা অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে।

বাণী—মাপ করবেন; আমি এখনই কিছু বলতে পারছি না।

নন্দী সাহেব—বেশ তো, কদিন পরেই বলো। কিন্তু কবে বলবে?

বাণী—পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি, তিনি কি বলেন।

নন্দী সাহেব—বেশ, তিনি যা বলেন সেটা তুমি এসে তাহলে আমাকে জানিয়ে যাবে?

বাণী—হ্যাঁ।

তাই আজকের সন্ধ্যার আকাশের তারা যেন দুরন্ত একটা জিজ্ঞাসার বিস্ময় নিয়ে জ্বলছে। বাণীর জীবনের উপর আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে কার মায়ার চোখ এমন ব্যাকুল হয়ে উঠলো? এ যে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না। বাণীর বাইশ বছর বয়সের জীবনের ছায়ার কাছেও এরকমের কোন রহস্যের ছায়া কোনদিন এগিয়ে আসেনি। একটা উপকারের ইচ্ছা বটে; কিন্তু উপকারটা যে ভয়ানক একটা ইচ্ছার দাবী বলে মনে হয়। বামাচরণবাবুর মেয়ে বি-এ পাশ করলে তার কিসের লাভ?

বাণীর চোখের উপর হঠাৎ একটা আলোর ঝলক লুটিয়ে পড়ে। ধাঁধিয়ে যায় বাণীর চোখ; আর সন্ধ্যার আকাশের তারাগুলি যেন সেই মুহূর্তে মুছে যায়।

একটা মোটর গাড়ির হেড লাইটের আলো বাণীর চোখের উপর এসে লুটিয়ে পড়ে। আর ছুটন্ত গাড়িটাও হঠাৎ মন্থর হয়ে বাড়ির ফটকের কাছে থেমে যায়। কার গাড়ি? এই সামান্য চেহারার ছোট বাড়িতে সত্যিই কোন অসামান্য এসেছেন বলে মনে হয়।

চমকে ওঠে বাণীর চোখ, শৈলেশ এসেছে।

বাড়ির বারান্দায় উঠে বাণীকে দেখতে পেয়েই শৈলেশের চোখ দুটো অন্ধকারের মধ্যেই যেন আভাময় হয়ে হেসে ওঠে। শৈলেশের গলার স্বরেও একটা খুশির উল্লাস হেসে ওঠে।—কি করছো বাণী?

বাণী বলে—একটু দাঁড়ান, আলো নিয়ে আসি।

শৈলেশ—না, অন্ধকারই ভাল।

বাণী হঠাৎ যেন বোবা হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না। বলবার মত কোন কথাও খুঁজে পায় না। অন্ধকার, তাই দেখতে পায় না শৈলেশ, বাণীর চোখের দৃষ্টিটাও যেন একটা বিস্ময়ের ভয়ে ভীরু হয়ে গিয়েছে।

শৈলেশ বলে—তোমার গান শুনে কী চমৎকারই যে লাগলো, কি বলবো?···কিন্তু···আমার একটা অভিযোগ আছে। সেদিন খুশি হয়ে তোমাকে আমি কত কথা বললাম, কিন্তু তুমি কোন কথা বললে না কেন?

বাণী—সেজন্যে কিছু মনে করবেন না।

শৈলেশ—মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার এখনও যেন লজ্জা করছে। কিংবা বোধহয় ভয় করছে।

বাণী এইবার সত্যিই লজ্জিত হয়—না না, ভয় করবার কি আছে?

শৈলেশ—তা হলে নির্ভয়ে একটা কথা বলি?

চমকে ওঠে বাণী—বলুন।

শৈলেশ—তোমাকে বি-এ পড়াবার আর পাশ করাবার ভার আমি নিতে চাই।

বাণী--না না ; আপনি কেন এসব ঝঞ্ঝাট সহ্য করবেন ?

শৈলেশ—তবে তুমি কি বি-এ পড়বার ইচ্ছে ছেড়ে দিয়েছ ?

বাণী—ইচ্ছে ছাড়িনি। যদি ভাগ্যে থাকে আর সুযোগ পাই, তবে পড়বো।

—আমিই তো সুযোগ করে দিচ্ছি।

—না না ; এটা ভাল দেখায় না। লোকেও ভাল বলবে না।

—আমি কি বলতে চাই, সেটা একটু ভাল করে শোন বাণী।

—বলুন।

—আমি চাই, এই সহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে হবে আমারই স্ত্রী।

মাথা হেঁট করে যেন একটা ভীরু নিঃশ্বাসের শিহর সামলাতে চায় বাণী।—না।

শৈলেশ আচ্ছা, যদি কথাটা অন্যভাবে বলি। যদি বলি, আমার স্ত্রী হবে এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। তবে ?

বাণীর শরীরটা কাঁপতে থাকে—কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

শৈলেশ—বলছি, আগে আমাদের বিয়ে হয়ে যাক্ ; তারপর তুমি বি-এ পড়বে।

বাণী—না না, আপনি কেন আমাকে বিয়ে করবেন ? কোন মানে হয় না।

শৈলেশ এইবার যেন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞার ছায়ার মত দু'পা এগিয়ে যেয়ে বাণীর কাছে দাঁড়ায়।—মানে আছে। আমি তোমাকে ভালবাসি।

হু'হাত তুলে চোখ ঢাকে বাণী।

শৈলেশ বলে—আমারও একটা লোভের আশা আছে, আমিও একটা গর্ব পেতে চাই, আমি এই শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ের স্বামী হতে চাই।

বাণীর প্রাণের বিস্ময়টাই যেন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে—আমি যাই ; পিসিমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শৈলেশ—না। আজ নয়। পিসিমার সঙ্গে কথা বলবার সময় আর সুযোগ অনেক পাওয়া যাবে। আজ শুধু তোমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে এসেছি।

বাণী—কথা তো বলেছেন।

শৈলেশ—কিন্তু তুমি তো সে কথাটা বললে না বাণী?

বাণী—কোন্ কথা?

শৈলেশ—আমাকে বিয়ে করতে কি তোমার ইচ্ছে নেই? কোন আপত্তি আছে?

বাণী—এসব কথা বলবেন না।

শৈলেশ হাসে—তবু তুমি স্পষ্ট করে এখনও বলতে পারলে না যে···।

বাণী—আপনি আমার মত মেয়ের আশার চেয়ে অনেক বেশী ; আমার আর কি-ই বা বলবার আছে?

শৈলেশ—আজ তবে চলি, বাণী।

চলে যায় শৈলেশ। শৈলেশের গাড়ির হর্ণের শব্দ সন্ধ্যার অন্ধকারের বাতাসে যেন একটা উতলা উল্লাসের মত ছড়িয়ে গড়িয়ে উধাও হয়ে যায়। আর ; সন্ধ্যার আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে বাণীর চোখের তারা হুটো যেন স্তব্ধ হয়ে জ্বলজ্বল করে।

পিসিমা ঘরের ভিতর থেকে ডাক দেন—বাণী।

—যাই।

—কে এসেছিল আর চলে গেল?

—শৈলেশবাবু।

—অ্যাঁ? মহিমবাবুর ছেলে শৈলেশ?

—হ্যাঁ।

—এর আগে কোনদিন এসেছিল নাকি?

—না।

—তবে আজ এল কেন?

পিসিমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাণীর মুখে যেন কোন ভাষা ফুটে উঠতে পারছে না। ঘরের ভিতরে চলে যায় বাণী।

সেই মুহূর্তে পাঁচিলের গা-ঘেঁষা টক পেয়ারার গাছের মগডাল থেকে আস্তে আস্তে নেমে আসে অভয় আর বিমল।

পকেটভর্তি টক পেয়ারা হাত দিয়ে চেপে ধরে হাঁপ ছাড়ে বিমল—আঃ, বাঁচা গেল।

অভয়—কিন্তু···।

বিমল—কি?

অভয়—কি বলবো বুঝতে পারছি না।

বিমল—কিন্তু এটা তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বাণীদি আমাদের এই টাউনেই থেকে যাবেন।

অভয়—শৈলেশদার সঙ্গে বাণীদির বিয়ে হলে তা তো হবেই। কিন্তু··।

বিমল—আবার কিন্তু কিসের?

অভয়—কিন্তু তাতে বাণীদির শুধু বিয়েই হবে, বি-এ পাস করতে আর হবে না।

বিমল—কেন? শৈলেশদা তো বললেন যে···।

অভয়—এখন তো বলছেন, শুধু বিয়েটাকে তাড়াতাড়ি বাগিয়ে ফেলবার জন্যে। কিন্তু পরে আর একথা বলবেন না।

বিমল—কিন্তু বাণীদি…।

অভয়—বাণীদিও কিছু বলবেন না। ওরকম ভীতু মানুষ জোর করে কিছু বলতেই পারে না।

বিমল—তাহলে…।

অভয়—তাহলে আবার কি? বাণীদি এবার শৈলেশদার স্ত্রী হয়ে মোটরগাড়িতে রোজ জোড়া-পাহাড় বেড়াতে যাবেন, এই হবে।

বিমল—তাই হবে বোধহয়। পড়াশোনা করতে সময়ই পাবেন না বাণীদি।

অভয়—পড়াশোনা করতে ইচ্ছেই হবে না।

বিমল—ইচ্ছে হয় তো হবে, কিন্তু…।

অভয়—আরে না; ইচ্ছেই হবে না। ইচ্ছে হয় না।

বিমল—কে বললে?

অভয়—ছোট কাকিমা। আগে কথা ছিল বিয়ের পর ছোট-কাকিমা বাপের বাড়ি সিউড়িতে চলে যাবেন আর ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত সিউড়িতে থেকে পড়াশোনা করবেন। তার পর আবার এখানে আসবেন। কিন্তু, দেখলি তো, ছোটকাকিমা কিছুতেই বাপের বাড়ি গেলেন না।

বিমল—কেন?

অভয়—ঐ যে বললাম, ইচ্ছে হয় না। ছোটকাকিমা স্পষ্ট করে ছোটকাকাকে বললেন, আর আমি এখন সিউড়ি যাব না, পড়াশোনা করতে একটুও ভাল লাগবে না, ইচ্ছেই হয় না।

॥ সাত ॥

এই ছোট সহরের মন একটা নতুন বিস্ময় সহ্য করতে গিয়ে ছটফট করে উঠেছে। কথাটা এরই মধ্যে রটে গিয়েছে। কথাটা বেশ একটা আশ্চর্যের কথা বইকি।

অনেকেই শুনে খুশি হয়েছেন। যেমন, বিমলের মা, হরেনবাবু দীননাথবাবু। শৈলেশের মত ছেলের সঙ্গে বাণীর বিয়ে হবে, এটা শুধু বাণীর জীবনের একটা সৌভাগ্য নয়, এটা এই সহরেরই জীবনের একটা চমৎকার শুভ ঘটনা। বিমলের মা বলেন—বাণীর বাপ বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হতেন।

মুহুরী বামাচরণবাবুর মেয়ে এই সহরের সবচেয়ে বড় বাড়িটার বউ হবে, সংবাদটা খুশির সংবাদ হলেও অনেকের কাছে কেমন-যেন একটু দুর্বোধ সংবাদ। কই, কোনদিন তো এমন কোন প্রমাণ দেখা যায়নি যে, মুহুরি বামাচরণবাবুর মেয়ে বাণীর জন্যে মহিমবাবুর ছেলে শৈলেশের মনে কোন ইচ্ছের ব্যাপার আছে। শৈলেশ কোনদিন বামাচরণবাবুর ঐ বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে কিনা সন্দেহ। শৈলেশের বাড়িতে কোন উৎসবের দিনেও বাণী কোনদিন এসেছে বলে কেউ শোনে নি, কেউ দেখেও নি। শৈলেশ বামাচরণবাবুকে ভাল করে চিনতো কিনা সন্দেহ।

অক্ষয়বাবু বলেন—এটা খুবই আকস্মিক একটা ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।

হরেনবাবু—ঠিক বুঝলাম না।

অক্ষয়বাবু—হঠাৎ কিছু একটা ব্যাপার হয়ে গেছে, তাই বামাচরণের মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে শৈলেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

হরেনবাবু—একথা বললেন কেন ?

অক্ষয়বাবু—আরে মশাই, এই তো মাস কয়েক আগে, বামাচরণ যেদিন মারা গেল, সেদিন শৈলেশই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বামাচরণবাবু কে ?

হরেনবাবু আশ্চর্য হন—তাই নাকি ?

অক্ষয়বাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ। একজন সামান্য মুহুরি মানুষের খোঁজ-খবর রাখবে, শৈলেশ সে ছেলেই নয়। তার প্রমাণ সেদিনই পেয়েছিলাম।

হরেনবাবু—আপনি কি বললেন ?

অক্ষয়বাবু—আমি বলেছিলাম, বামাচরণকে সকলেই যে চেনে শৈলেশ ; মুহুরি মানুষ হলেও সে যেমন-তেমন একটা লোক নয়। তার মেয়ে বাণী এ সহরের সব চেয়ে শিক্ষিতা মেয়ে। এইবার বি-এ পড়বে মেয়েটি।

হরেনবাবু খুশি হয়ে হাসেন—বলে ভালই করেছিলেন।

অক্ষয়বাবু—আরও একটা স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ শৈলেশের কথার মধ্যে ঐ অহংকারের ভাবটা আমার ভাল লাগেনি।

হরেনবাবু—কি বলেছিলেন ?

অক্ষয়বাবু—বললাম, বামাচরণ সামান্য মুহুরী বটে, কিন্তু তার মেয়ে আমাদের এ টাউনের গর্ব। বাণীই এই সহরের প্রথম মেয়ে যে একদিন গ্র্যাজুয়েট হবে ; বিদুষী কামিনী রায়ের আশা সফল হবে।

হরেনবাবু—তবে তো মনে হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে ঐ স্পষ্ট কথার শিক্ষা পেয়েই শৈলেশ বাণীকে বিয়ে করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে।

অক্ষয়বাবু—হতে পারে।

শেখরের মা'ও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি।—শৈলেশের সঙ্গে বাণীর তো কোনদিন চেনা-শোনা ছিল না।

বিমলের মা হাসেন—ছিল না, কিন্তু হয়েছে।

—কে বললে ?

—যারা দেখেছে তারাই বললে।

—কে ?

—বিমল আর অভয়।

—ওরা আবার কি দেখলো ? আর কি-ই বা বুঝলো ?

—ওরাই ঠিক দেখতে পায়; আর সব চেয়ে ভাল বুঝতে পারে।

শেখরের মা খুশি হয়ে হাসেন—যাক্, খুব ভালই হলো বলতে হবে।

বিমলের মা—ভাল বইকি। বাণী না হয় গরীবের মেয়ে, কিন্তু আর কোন্ রূপটি বা গুণটি ওর নেই যা কোন রাজকুমারীর আছে ?

শেখরের মা—জিতগড়ের রাজকুমারীকেও তো দেখেছি দিদি ; রূপ মন্দ নয় ; কিন্তু ক লিখতে কলম ভাঙ্গে, এমনই মুখ্খু।

বিমলের মা—এখন যেন বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে···।

শেখরের মা—কি ?

—ছেলেরা সেদিন যে-কথাটা বলেছিল।

—কোন্ কথা ?

—ঐ যে, বাণীদির গানটা শৈলেশদার খুব ভাল লেগে গিয়েছে।

—বাণীর গানটা ভাল লাগলো বলেই কি বাণীকে ভাল লাগলো ?

—হতে পারে। আবার অন্যটাও হতে পারে।

—তার মানে ?

—বাণীকে দেখে খুব ভাল লেগেছিল বলেই হয়তো গানটাকেও ভাল লেগেছিল।

—বাণীকে আগেও তো দেখেছে শৈলেশ। না দেখবার কথা নয়। কিন্তু কই, তখন তো কোন কাণ্ড বাধে নি। তখন কি বাণীর মুখটা সুন্দর ছিল না ?

—আমিও ঠিক এই কথাই ভেবেছি। হঠাৎ কেন বাণীকে বিয়ে করবার জন্যে শৈলেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলো ?

—তবে কি বাণী নিজেই ইচ্ছা করে⋯।

—না না, কখ্‌খনো না, বাণী সে মেয়েই নয়। অভয় বললে, শৈলেশদাকে বাণীদি প্রথমে গ্রাহ্যই করেনি।

—ওরা দেখেছে ?

—হ্যাঁ গো, ব ণী বার বার আপত্তি করেছিল।

—ওরা শুনেছে ?

—হ্যাঁ গো। শৈলেশ অবিশ্যি বাণীকে একটা ভাল কথা বলেছে। বিয়ের পর বি-এ পড়বে বাণী।

—সেটা কি আর সম্ভব হবে ? অভয়ের ছোটখুড়ির কাণ্ডটা তো দেখলেন।

—আমি তো অভয়ের ছোটকাকা চারুর কাণ্ডটাই দেখলাম।

—কি দেখলেন ?

—দোষ চারুর। স্ত্রীর আপত্তি শুনেই একেবারে গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়লো। জোরগলায় বৌকে একবার বলতেও পারলো না যে, ম্যাট্রিকটা পাশ করতেই হবে।

—শৈলেশও যদি বাণীর আপত্তি দেখে ওরকম গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে, তবে ?

—বাণী আপত্তি করবে? অসম্ভব? বি-এ পাশ করা যে মেয়েটার স্বপ্ন।

শেখরের মা মাথা নেড়ে হাসতে থাকেন—কিন্তু ব্যাপারটা তো একই দাঁড়ালো। একা চারু বেচারা নয়; সবাই, শৈলেশও, একালের সব মদ্দ মশাই স্ত্রীর ইচ্ছার কাছে গলে গিয়ে গড়িয়ে পড়েন।

বিমলের মা—শেখরের বাবা কি গড়িয়ে পড়েন নি?

—কোনদিনও না; ভুলেও না।

—একটুও বিশ্বাস করি না।

—শুনলে বিশ্বাস করবেন?

—কি?

—আপনি তো জানেন, কাশীর জর্দা ছাড়া আমার মুখে পান রোচে না।

—জানি।

—এই সাতদিনের মধ্যে সাত বার ভদ্রলোককে মনে করিয়ে দিয়েছি, যেন রামনাথের দোকান থেকে এক ডিবে কাশীর জর্দা কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু এনেছে কি?

—জানি না।

—তবে জেনে রাখুন। আনেনি।

॥ আট ॥

প্রকাশ মাষ্টারের ঘর।

অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার, চার জনে একসঙ্গে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি দেয়।

কি আশ্চর্য, একটা বই হাতে নিয়ে ঘরের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন সেকেণ্ড স্যার প্রকাশ দা। চোখের পলক পড়ছে না। সে চোখে যেন একটা স্বপ্ন-দেখা আনন্দ থমথম করছে। হাসছে প্রকাশ মাষ্টারের চোখ ছুটো।

—আমি অভয়; আমরা এসেছি প্রকাশ দা। হাঁক দেয় অভয়।

চমকে ওঠে প্রকাশ মাষ্টার।—কে···হ্যাঁ···কেন···ভেতরে এস।

চার জনে ভেতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনিই এখন আমাদের এই টাউনের গর্ব।

প্রকাশ—তার মানে? একথা তোমরা বলছো কেন?

বিমল—আমরা বলছি না প্রকাশ দা। যিনি বলছেন, তিনি আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বড়।

—কে? কে বললেন একথা? প্রকাশ মাষ্টারের উজ্জ্বল চোখে যেন তীব্র একটা প্রশ্নের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

অভয়—বলছিলেন দীননাথ বাবু।

প্রকাশ মাষ্টারের চোখের বিদ্যুৎ যেন হঠাৎ লজ্জিত হয়ে সরে যায়। যেন একটা গোপন কৌতূহলের চাপা উল্লাসও লজ্জিত হয়েছে। আস্তে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে প্রকাশ—তাই বল।

অভয়—আপনি আমাদের এই টাউনে আগে কখনো এসেছিলেন প্রকাশ দা?

প্রকাশ—না।

শেখর—এই প্রথম এসেছেন?

প্রকাশ—হ্যাঁ।

নীহার—কিন্তু কবে এসেছিলেন স্যার?

প্রকাশ—এই তো···এই সেদিন, তার মানে—

অভয়—জলধর স্যার যেদিন চলে গেলেন, সেদিনই বোধ হয়?

প্রকাশের শান্ত চোখের তারা দুটো চমকে ওঠে।—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু তুমি কেমন করে জানলে?

অভয়—আমরা যে সেদিনই প্রথম আপনাকে দেখলাম।

প্রকাশ—কোথায় দেখেছিলে?

অভয়—জলধর স্যারের বিদায় সভাতে।

প্রকাশ—ঠিক বলেছ।

নীহার—কিন্তু আপনি কেমন করে সভাতে এলেন স্যার; আপনি কি আগেই জানতেন যে···।

প্রকাশ হাসে—আমি কিছুই জানতাম না। সকাল বেলায় এই টাউনে এসে পৌঁছেছিলাম; ধর্মশালায় ছিলাম। আর বিকেল হলে গয়া যাবার বাসের টিকিট কিনে রেখেছিলাম। আর সন্ধ্যা হতেই বাস ধরবার জন্যে চকের দিকে চলে যাচ্ছিলাম।

শেখর—তাহলে চলে যাননি শেষ পর্যন্ত?

প্রকাশ—না; দেখতেই তো পাচ্ছ, চলে যেতে পারিনি।

অভয়—কেন প্রকাশ দা?

প্রকাশ—ঐ যে, হঠাৎ চোখে পড়লো একটা মিটিং হচ্ছে;

অনেক লোকজনের ভীড় হয়েছে। আমিও হঠাৎ সভার ঘরের ভেতরে চলে এলাম।

অভয়—বাণীদির গানও তো শুনেছিলেন ?

প্রকাশ—অ্যাঁ ?

অভয়—বাণীদিকে কিন্তু আপনি একটুও চেনেন না।

প্রকাশ—না, চিনি না ; তবে শুনেছি। তোমাদের টাউনের অক্ষয়বাবু আর হরেনবাবু সেদিন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন কিনা, তাই শুনতে পেলাম, তোমাদের বাণীদির নাকি বি-এ পাশ করবার খুব ইচ্ছে।

বিমল—একথা সকলেই জানে স্যার। আমরাও অনেকদিন আগেই জানতাম।

প্রকাশ—আমি সেদিন প্রথম শুনলাম। সেই জন্যেই তো··· ।

প্রকাশ মাষ্টারের মুখের ভাষা যেন হঠাৎ-ভয়ে থমকে যায়।

অভয় যেন খুশি হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।—কি জন্যে স্যার ? বলুন না প্রকাশ দা।

প্রকাশ—কি বলছো ?

নীহার—আপনি কি বলতে গিয়ে আর বললেন না স্যার।

প্রকাশ—বলছিলাম, আমারও হঠাৎ ইচ্ছে হলো, এই সহরে থেকে যাই।

অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার একেবারে শান্ত ও নীরব হয়ে, যেন দুরন্ত একটা সত্যের সংবাদ শোনবার প্রতীক্ষায় সেকেণ্ড স্যার প্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রকাশ হেসে ওঠে।—তাই ইচ্ছে করে তোমাদের সেকেণ্ড স্যার হয়ে গেলাম।

বিমল—কিন্তু আপনি কোনদিন হঠাৎ আমাদের স্কুল ছেড়ে

দেবেন না তো প্রকাশদা ?

প্রকাশ—ইচ্ছে তো নেই ; তবে ভাগ্য যদি কোনোদিন বলে ছেড়ে দাও, তবে ছেড়ে দিতেই হবে।

শেখর—সেটা আপনার ভাগ্য হবে ঠিকই, কিন্তু আমাদের স্যার দুর্ভাগ্য হবে।

প্রকাশ—তার মানে ?

নীহার—তার মানে, আপনি অন্য কোনো টাউনেব স্কুলে অনায়াসে এর চেয়ে অনেক ভাল মাইনের সেকেণ্ড স্যার কিংবা হেড স্যার হয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা আর আপনার মত সেকেণ্ড স্যার পাব না।

প্রকাশ—না, তা নয়। আমার চেয়ে কত ভাল-ভাল স্যার পৃথিবীতে আছে। যাক্, আজ তাহলে তোমরা এস : আমি এখনই একবার বের হব।

অভয়—কোন্ দিকে যাবেন ?

প্রকাশ—একবার নন্দী সাহেবের বাড়িতে যাব।

নীহার—বই আনতে ?

প্রকাশ—না···হ্যাঁ···বই অবশ্য আনবো ; কিন্তু তাঁর কাছ থেকে খুব দরকারী একটা কথাও জানবার ছিল।

বিমল—কি কথা স্যার ?

প্রকাশ—সব কথাই কি তোমাদের কাছে বলা যায় ? ধরে নাও, একটা কাজের কথা।

অভয় বলে—আমাদের একটা অনুরোধ আছে প্রকাশদা।

প্রকাশ—বল।

অভয়—আপনার এই বিচ্ছিরি এলোমেলো ঘরটাকে একটু পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন করে দিতে চাই।

প্রকাশ—না না, ওসব কাজ তোমাদের করতে হবে না। উচিতও নয়।

অভয়—না প্রকাশদা, আপনি আপত্তি করবেন না। আমাদের কোন স্যারের ঘর আপনার এই ঘরের মত ছন্নছাড়া নয়।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে প্রকাশ—ছন্নছাড়া। তোমরাও দেখছি এরই মধ্যে সাংঘাতিক সব ভাল কথা শিখে ফেলেছো। যাই হোক্, যা ইচ্ছে হয় কর। আমি আসছি।

চলে যায় প্রকাশ মাস্টার। কিন্তু ঘরের জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে বিমল আশ্চর্য হয়—এ কি রে অভয়? প্রকাশদার বাক্সটা যে একেবারে হাল্‌কা, ঢনঢন করছে; ভেতরে কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে?

অভয়—তালা চাবিও তো নেই। একবার খুলেই দেখ না, ভেতরে কি আছে?

প্রকাশ মাস্টারের বাক্সটার ডালা তুলে ধরে বিমল; আর চার ছাত্রের চার জোড়া চোখ হতভম্ব হয়ে যেন একটা বিস্ময়কে দেখতে থাকে। বাক্সের ভিতরে একটা কাপড়ও নেই; টাকা পয়সাও কিছুই নেই। শুধু মোটরবাসের একটা পুরনো টিকিট পড়ে আছে। গয়া যাবার টিকিট; ঠিকই, টিকিটের তারিখটা হলো সেই তারিখ, যেদিন বুড়ো জলধর স্যারের বিদায়-সভা হয়েছিল।

এই পুরনো টিকিটটা যেন ভয়ানক জাগ্রত একটা সাক্ষী, একটা দিনের স্মৃতিকে যেন চিরকালের মত কাছে ধরে রাখবার জন্য ছোট্ট একটা বাক্সের বুকের নিরাপদ নিভৃতে আশ্রয় নিয়েছে। কিংবা, প্রকাশ মাস্টারের ভাগ্যপত্রিকার একটা ছেঁড়া পাতা।

—এর মানে কি রে অভয়? বিড়বিড় করে বিমল।

অভয়— আমি যা ভেবেছিলাম, তাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।

শেখর—কি ভেবেছিলি ?

অভয়—আসল কথা হলো, বাণীদির সেই গানটা।

নীহার—তার মানে ?

অভয়—বাণীদির গানটার জন্যেই প্রকাশদা এই টাউনে রয়ে গেলেন।

নীহার--কী যা-তা বলছিস !

অভয়--তর্ক রেখে দে ; এখন কাজ কর।

চার ছাত্র একসঙ্গে হাত চালিয়ে রহস্যময় এক সেকেণ্ড স্যারের ছন্নছাড়া ঘরের চেহারা পরিচ্ছন্ন করতে গিয়েই যেন অলস হয়ে যায়। বইগুলিকে বিছানার একদিকে সরিয়ে আর সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বালিসের নীচে মোট সাতটা টাকা ছিল। টাকাগুলোকে একটা কাগজে মুড়ে বালিশের নীচে রেখে দেওয়া হয়েছে। আলনাতে শুধু একটা জামা আর দুটো ধুতি ঝুলছে। ওগুলো সাজিয়ে রাখবার মত জিনিসই নয়। বাস্, সাজাবার আর গুছিয়ে রাখবার যে কিছুই নেই। চমৎকার একটা শূণ্যতাকে সঙ্গে নিয়ে এই ছোট্ট ঘরের ভিতরে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে থাকতে পারে প্রকাশ মাস্টার।

চার ছাত্রের দুরন্ত চেহারাগুলি স্তব্ধ হয়ে ঘরের এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ অদ্ভুত অথচ ভয়ঙ্কর একটা ইচ্ছার কথা বলে সকলকে চমকে দেয় অভয়।- আমার ইচ্ছে ছিল···আমি ভেবেছিলাম, অন্তত একটা পুরনো চিঠি পাওয়া যাবে। কিন্তু কিচ্ছু না, প্রকাশদা একেবারে একটা সন্ন্যাসী।

নীহার ভয়ে-ভয়ে বলে—চিঠি পেলে কি হতো ?

অভয়—বুঝতে পারা যেত।

শেখর—কি ?

অভয়—তোর মাথা।

শেখর—তুমি যদি এরকম বিচ্ছিরি ডিটেকটিভি কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে কোনদিন কোন কাজে শেয়ার নিতে পারবো না।

অভয় মুখ টিপে হাসে—কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করবি তো?

অভয়ের প্রশ্নের উত্তরে শেখর যা বলতো, সেটা আর শেখরের বলা হলো না। কারণ, ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে প্রকাশ মাস্টার।

প্রকাশ মাস্টারের চোখে আর সেই উজ্জ্বলতা হাসছে না। দৃষ্টিটা বেশ বিষণ্ণ। যেন অনেক আশা নিয়ে প্রকাশ মাস্টারের জীবনের একটা রহস্যময় ব্যস্ততা কোথাও ছুটে গিয়েছিল, আর, কোন আশার সাক্ষাৎ না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসেছে। প্রকাশের কপালে ছোট ছোট ঘামের বিন্দু টলমল করছে। ঠিকই, প্রকাশ মাস্টারের চেহারাটাকে একটা ক্লান্তির চেহারা বলে মনে হচ্ছে।

আনমনার মত কথা বলে প্রকাশ মাস্টার—তোমরা এখনও এখানে আছ?

বিমল—হ্যাঁ, প্রকাশদা।

শেখর—আপনি না আসা পর্যন্ত চলে যাই কি করে?

নীহার—ঘরের দরজা খোলা রেখে চলে যাওয়া তো উচিত নয়।

প্রকাশ মাষ্টার হাসতে চেষ্টা করে।— আমি যখন বাইরে যাই তখন ঘরের দরজা খোলাই পড়ে থাকে।

অভয়—কেন স্যার?

প্রকাশ—তালা চাবি নেই। যাই হোক্, তোমরা এখন তাহলে ··।

অভয়—আপনার ঘরের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখেছি।

প্রকাশ—খুব ভাল করেছ।

অভয়—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন প্রকাশদা?

প্রকাশ—গিয়েছিলাম…এক ভদ্রলোকের কাছে একটা কথা জানবার জন্যে। কিন্তু, জানা গেল না।

অভয়—ভদ্রলোকের দেখা পেলেন না?

প্রকাশ—ভদ্রলোকের দেখা পেয়েছি, কিন্তু…।

নীহার—কি স্যার?

প্রকাশ—তার কাছে একজনের এসে একটা কথা বলে যাবার ছিল, সেটা সে বলেনি; বলতে আসেও নি।

অভয়—তাহলে হয়তো অন্য একদিন এসে বলে যাবে।

প্রকাশ—আমারও তাই মনে হচ্ছে। তাই ভেবেছি, আর একদিন গিয়ে খোঁজ নেব।

ছোট গলির ভিতরে এই ছোট ঘরের ভিতরে প্রকাশ মাষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত চার ছাত্রের চার চেহারা হঠাৎ চমকে ওঠে; কারণ, নিকটের বড় সড়কের উপর একটা ছুটন্ত মোটরগাড়ির হর্ণের শব্দ চমকে উঠেছে।

নীহার—শৈলেশদার গাড়ি।

শেখর—বোধহয় কোর্টে যাচ্ছেন শৈলেশ দা।

বিমল—এটা শৈলেশদার গাড়ির নতুন হর্ণ। কিন্তু আগের হর্ণের শব্দটাই মিষ্টি ছিল।

অভয়—আপনিও নিশ্চয় শুনেছেন প্রকাশদা।

প্রকাশ—কি?

অভয়—শৈলেশদার বিয়ে?

প্রকাশ—আমাদের স্কুলের সেক্রেটারী শৈলেশবাবুর বিয়ে?

অভয়—হ্যাঁ।

প্রকাশ—কবে ?

অভয়—কবে হবে সেটা শুনিনি। তবে একদিন হবে।

প্রকাশ—সুসংবাদ।

নীহার—হ্যাঁ স্যার, সবাই বলছেন সুসংবাদ। বাণীদির সঙ্গে শৈলেশদার বিয়ে হবে।

প্রকাশ মাষ্টারের চোখের দুই তারায় যেন একটা জ্বলন্ত বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে।—বাণীদি কে ? কোন্ বাণীদি ?

অভয়—দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, চমৎকার গান চমৎকার গলায় গাইতে পারেন যে বাণীদি। আমাদের, এই টাউনে ঐ গান আর কেউ গাইতে পারে না।

প্রকাশ মাষ্টারের চোখের তারা আবার হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। যেন দুটো পাথুরে চোখের তারা। বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে থাকবার পরে প্রকাশ মাষ্টার যেন একটা নিঃশ্বাসের শব্দ সামলে নিয়ে কথা বলে—আচ্ছা, এস তোমরা।

ঘরের বাইরে এসে অভয় হাসতে থাকে।—বুঝেছি।

নীহার—কি ?

চেঁচিয়ে ওঠে অভয়—না, কোন কথা বলবার সময় নেই। এইবার বাড়ি যাব ; কার সাধ্য রোধে মোর গতি ? ছোটকাকার হাতে কানমলা থেকে বাঁচতে হলে···না, সত্যিই রে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

ছুটে চলে যায় অভয়।

॥ নয় ॥

বামাচরণবাবুর মেয়ে বাণীর সঙ্গে শৈলেশের বিয়ে হবে, এ জনরব আর চুপি-চুপি বা কাণাকাণি আলোচনার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এ জনরব এই টাউনের একটা মুখরিত হর্ষ।

জনরবের চুপি-চুপি গুঞ্জরণের পালা কিন্তু অনেকদিন ধরে চলেছে। পুরো তিনটে মাস। কে জানে এই মুখরিত হর্ষের পালা আর কতদিন চলবে? এটাও তো তিনটে মাস ধরে চলছে। অভয় আর বিমলদের ক্লাস এইটের ফাইন্যাল পরীক্ষাটাও পার হয়ে গিয়েছে। ওরা পাশ করেছে। ওরা এখন ক্লাস নাইন।

প্রকাশের সেকেণ্ড মাস্টারীর জীবনের হিসাব ধরলে বোঝা যায়; তারও জীবনের একটা বছর এই সহরে পার হয়ে যেতে চলেছে। আর মাত্র একটি মাস বাকি; টেম্পোরারী প্রকাশের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। কারণ, সেক্রেটারী শৈলেশ মাত্র এক বছরের জন্য প্রকাশের এই সেকেণ্ড মাস্টারীর কাজটা মঞ্জুর করেছিল। প্রকাশকে একথাও বেশ স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল শৈলেশ --মাত্র এক বছর। এর পর আমাদের ইচ্ছা। যদি আমরা ভাল বুঝি, তবে আপনার চাকরির মেয়াদ আরও বাড়িয়ে দেব। আপনি কিন্তু দাবি করতে পারবেন না যে···।

প্রকাশও বলেছিল---আজ্ঞে না, আমি কোন দাবি করবো না।

আজকাল আর শুধু সন্ধ্যের আলো-আঁধারের আবরণের ভেতর দিয়ে কুণ্ঠিত আগ্রহের মত নয়; শৈলেশের গাড়ি নতুন হর্ষের শব্দ ছড়িয়ে সকালবেলাতেও বামাচরণবাবুর সামান্য চেহারার বাড়িটার ফটকের কাছে এসে থামে। বাণীরও চোখে আর সেই ভীরু

বিস্ময়ের চিহ্ন নেই। অনেকেই দেখতে পেয়েছে, প্রকাশ যখন আসে তখন বাণীও যেন সুস্মিত অভ্যর্থনার মত বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোট সহরের মুখরিত হর্ষটার মনে যে সামান্য একটু সন্দেহ ছিল, সেটুকুও আর রইল না, যেদিন দেখা গেল যে, শৈলেশের বাড়িকে উৎসবের সাজ পরাবার জন্য কলকাতা থেকে ডেকোরেটর এসেছে। রঙীন বেলোয়ারির কত ঝাড়বাতি, কত চীনে লণ্ঠন, কত চাঁদমালা আর কত শোলার ফুলের বড়-বড় মালা।

কলকাতা থেকে শৈলেশের এক জেঠা মশাই আর জেঠতুতো বোনেরা এসেছে। শৈলেশের মা বিনয় ভট্চাজকে বাড়িতে ডেকে শুভদিন আর শুভলগ্নের কথা আলোচনা করেছেন। কোন সন্দেহ নেই, আর কদিন পরেই এই ছোট সহরের বাঙ্গালী অবাঙ্গালী সব ভদ্রলোকের বাড়িতে প্রজাপতির ছবি-আঁকা নিমন্ত্রণের চিঠি পৌঁছে যাবে।

শৈলেশের জেঠামশাই নৃপতিবাবু নিজেও বাড়ি-বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করবেন : একথা শৈলেশের মা একদিন বিমলের মা'র কাছে বলেছেন।

বাণীর চোখ দুটোও নিশ্চয়ই সন্ধ্যা আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে এই আসন্ন উৎসবের ঝিকিমিকি হাসিটাকে দেখতে পায়। কিন্তু, কী আশ্চর্য, বাণীর এই সৌভাগ্যময় উৎসবের সব আয়োজন আর ব্যস্ততার নেপথ্যে যেন একটা করুণ ছায়া দাঁড়িয়ে আছে, আর, কি-যেন বলতে চাইছে। ভাবতে গিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে বাণী।

অন্ধ নন্দী সাহেবের কি মাথা খারাপ হয়েছে? তা না হলে এরকম উদ্বিগ্নের মত বারবার বাণীর কাছে চিঠি পাঠাবেন কেন? সব চিঠিতে সেই একই কথা; কই, তুমি তো আর এলে না?

আমার চিঠির কোন উত্তরও দিলে না। কিন্তু আমি জানি, এটা তোমার পক্ষে মস্ত সুযোগ। ছেলেটি খুবই বিদ্বান; তার কাছে পড়লে তুমি নিশ্চয় ভালভাবে বি-এ পাশ করবে।

অসম্ভব। অন্ধ নন্দী সাহেবের এই অনুরোধের যে আর কোন অর্থ হয় না। বি-এ পড়বার আর পাশ করবার সুযোগ যে একটা উৎসব হয়ে বাণীর জীবনের কাছে চলে এসেছে।

অন্ধ নন্দী সাহেবের শেষ চিঠিটার কথাগুলি যেন কারও দুঃসহ অভিমানের প্রতিধ্বনি।—মনে হচ্ছে, তুমি এই ছেলেটির কাছে পড়তে চাও না। হয়তো কোন বাধা আছে। যদি তাই হয়, তবে জানিয়ে দিও। কারণ, ছেলেটি তাহলে···।

নন্দী সাহেবের চিঠির শেষ কথাগুলি পড়তে গিয়ে বাণীর চোখ দুটো কেঁপে উঠেছিল।—ছেলেটি তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারবে।

কে এই ভয়ংকর গোপন উপকারের স্বপ্নধর? আজ পর্যন্ত তার নামটা স্পষ্ট করে লিখে জানাতে পারলেন না নন্দী সাহেব! সন্দেহ না হয়ে পারে না, এমন মানুষ বাণীর চেয়েও ভীরু-মনের একটা মানুষ। চোখের সামনে এসে দাঁড়াবার আর মুখ তুলে কথা বলবার সাহস নেই; এ যেন একটা লোভী অপরাধের করুণ দাবী। এমন দাবীর উত্তর জানাতেও যে ভয় করে।

না, উত্তর দেওয়া উচিত নয়। নন্দী সাহেবের নিজেরই বুঝে নেওয়া উচিত যে, বাণীর পক্ষে এভাবে এক নিতান্ত অপরিচিত রহস্যের উপকার নেওয়া সম্ভব নয়। এই শেষ চিঠির উত্তর না দিলেই ভাল হবে। বুঝে নিতে পারবেন নন্দী সাহেব; বাণী আর তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতে পারে না বলেই চিঠির উত্তর দিল না।

না, চিঠির উত্তর না দেওয়া অন্ধ নন্দী সাহেবের একটা

সদিচ্ছাকে অপমান করা। আর, বাণীর প্রাণটা তো ঠিক নন্দী সাহেবকে সন্দেহ করছে না। কাজেই, লিখে জানিয়ে দিতে দোষ কি?

ভাবতে গিয়ে বাণীর চোখে সেদিনের আকাশের সন্ধ্যাতারাও যেন একটু করুণ হয়ে যায়। কি বিশ্রী একটা দুর্বলতার মন যেন বাণীর চোখের হাসিকেও বিষণ্ন করে দেয়।

কিন্তু আর ভেবে লাভ কি? নেপথ্যের এই ভয়ংকর আহ্বানকে নিশ্চিন্ত করে দেওয়াই ভাল। শ্রদ্ধাস্পদেষু—নন্দী সাহেবের কাছে চিঠি লেখে বাণী।—আমার এখন কারও কাছে পড়বার দরকার নেই। আপনি শুনে সুখী হবেন যে, আমার বি-এ পড়বার এখন আর কোন অসুবিধা নেই।

॥ দশ ॥

যে উৎসবটা সত্যিকারের একটা জাঁকাল উৎসব হয়ে দেখা দেবে, সেটা হলো বউ-ভাতের উৎসব ; অর্থাৎ রঙীন বেলোয়ারীর ঝাড়বাতি দিয়ে সাজানো শৈলেশের বাড়ির উৎসব। সেটা আর দু'দিন পরে দেখা দেবে। আজ শুধু পরলোকগত মুহুরী বামাচরণ বাবুর এই সামান্য চেহারার বাড়িটার প্রাণে ধূপ দীপ আর উলুরবের সামান্য একটা উৎসব জেগেছে। বাণীর পিসি কিছু টাকা খরচ করেছেন। তাই কিছু নিমন্ত্রিতের ভিড়ও হয়েছে।

অভয় আর বিমল, নীহার আর শেখরকে বাণী নিজেই নেমন্তন্ন করেছিল। হেসে হেসে নেমন্তন্নের কথা বলতে গিয়ে বাণীর চোখ দুটো জলে ভিজে গিয়েছিল। অভয়ও আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—এ কি বাণীদি ? এমন চমৎকার একটা নেমন্তন্নের কথা বলতে গিয়ে আপনি কেঁদে ফেললেন কেন ?

বাণী হাসতে চেষ্টা করে।—সত্যিই ভাই, কেন যেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।

অভয়—ভাল লাগছে না ?

বাণী—না, ভাল লাগছে বইকি ; কিন্তু কেমন ভয়-ভয় করছে।

অভয়—ওটা ভয় নয় বাণীদি, ওটা হলো লজ্জা। বিয়ের সময় সব মেয়েরেই এরকম লজ্জা হয়।

বাণীও হাসে—হ্যাঁ, বেশ একটু লজ্জাই করছে।

টক-পেয়ারার গাছের গায়ে একটা বড় বাতি ঝুলছে। বারান্দার উপর সতরঞ্চ পাতা হয়েছে। অনেকেই এসেছেন।

নিমন্ত্রিত হয়ে অভয়দের স্কুলের সব টীচার এসেছেন। বাণীর পিসিমা জানেন, বামাচরণবাবুর সঙ্গে স্কুলের টীচারদের খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল। তাই তাঁদের নিমন্ত্রণ জানাতে ভুলে যাননি পিসিমা।

অভয় বলে—বাণীদির পিসিমা কিন্তু একটা ভুল করেছেন।

বিমল—কি ?

অভয়—প্রকাশদাকেও নেমন্তন্ন করা উচিত ছিল।

নীহার—আমার বিশ্বাস, প্রকাশদাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে।

অভয়—তাহলে প্রকাশদা আসবেন না কেন ?

শেখর—কে জানে কেন।

বিমল—অথচ একদিন কোন নেমন্তন্ন না পেয়েও জলধর স্যারের বিদায় সভাতে বেশ তো সশরীরে হাজির হতে পেরে-ছিলেন।

অভয়—বাণীদির সঙ্গে একবার দেখা করে জিজ্ঞাসা করলে হয় ; সত্যিই সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে কিনা।

নীহার—বাণীদিকে কেন জিজ্ঞেস করবো ? বাণীদি কি নিজের থেকে ইচ্ছে করে আর নাম ধরে ধরে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছেন ? কখ্খনো না।

শেখর—তবে বাণীদির পিসিমাকে জিজ্ঞেস করি ; উনিই তো শ্যামবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আর বাড়ি-বাড়ি ঘুরে নিমন্ত্রণ করেছেন।

বিমল—ঐ তো, বাণীদির পিসিমা সরোজকাকার সঙ্গে কথা বলছেন।

এগিয়ে যায় অভয় ; আর বাণীর পিসিমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে একেবারে সোজা ভাষায় জিজ্ঞাসা করে ফেলে—আমাদের স্কুলের সব স্যারকে নেমন্তন্ন করে শুধু সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে বয়কট করলেন কেন ?

পিসিমা ভ্রুকুটি করে তাকান—কে তুমি ?

অভয়—আমিও একজন গেস্ট, যদিও আপনি আমাকে চেনেন না। কথা হলো, আমরা খুব দুঃখিত ; সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে বাদ দিয়ে আপনি খুব ভুল করেছেন।

পিসিমা—আমি তো জানি না, কে তোমাদের প্রকাশদা আর কে তোমাদের বিকাশদা। বাণী যাদের নাম বলেছে, যারা বাণীর বাবার চেনা-মানুষ ছিল, তাদেরই নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কিন্তু তুমি কেন হঠাৎ এসে ঐটুকু মুখে এত বড়-বড় বাজে কথা বলছো ?

কি-যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায় অভয়। সরোজবাবু বলেন—তুমি বড়দের সঙ্গে এভাবে কথা বল কেন অভয় ? খুব অন্যায়।

পিসিমা বলেন—একটু বেশি বাচাল বলে মনে হচ্ছে।

এই সব ভর্ৎসনার কথা শুনেও অভয় কোন উত্তর দেয় না ; অভয়ের দুই চোখ যেন বিস্মিত হয়ে দেখছে একটা ঘরের ভিতরে আলোর কাছে বসে আছে ফুল্লহাসির ছবির মত একটি সুন্দর মূর্তি। কী চমৎকার সেজেছেন বাণীদি।

অভয়কে দেখতে পেয়েছে বাণী। তাই হাত তুলে ডাকছে। এগিয়ে যায় অভয়।

বাণী বলে—কখন এলে অভয় ?

অভয়—এই তো কিছুক্ষণ আগে।

বাণী—বিমল নীহার আর শেখর আসেনি ?

অভয়—এসেছে।

বাণী—না এলে কিন্তু আমি খুব দুঃখিত হতাম।

অভয়—আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে দুঃখিত।

বাণী—কি ব্যাপার ?

অভয়—আমাদের স্কুলের সব টিচারকে নেমন্তন্ন করা হলো ; আপনিই নাকি সবারই নাম বলে দিয়েছেন ; তবে প্রকাশদা বাদ গেলেন কেন ?

বাণী—প্রকাশদা কে ?

অভয়—আমাদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদা।

বাণী—আমি ভাই সত্যিই জানতুম না যে, প্রকাশদা নামে কোন টিচার আছেন।

অভয়—তাই বলুন ! কিন্তু···।

বাণী—কি ?

অভয়—প্রকাশদার নামটা আপনি এতদিনের মধ্যে, এই এক বছরের মধ্যেও শুনতে পাননি, এটা আশ্চর্য।

বাণী—আশ্চর্য কেন ?

অভয়—প্রকাশদা যদিও নতুন টিচার ; কিন্তু আজ কে না প্রকাশদার নাম জানে ? যাঁর লেকচার শুনে জিনরাজদাস অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর নাম আপনি জানেন না, বাস্তবিক, আপনি আজকাল আমাদের টাউনের ভাল-মন্দ কোন খবরই রাখেন না দেখছি।

বাণীর চোখ দুটো অপলক হয়ে অভয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। অভয়ের আবোল-তাবোল অভিযোগের ভাষাটা যেন একটা নিদারুণ অর্থময় প্রলাপের ভাষা। আর, যেন অনেক দূরের কুয়াশার মধ্যে একটা মূর্তিকে এইবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই মূর্তিটাই কি সেই ভয়ানক গোপন অভিসন্ধির মূর্তি ? বক্তৃতা দিয়ে জিনরাজদাসকেও অবাক করে দেয়, এমন একজন মানুষ এই সহরে প্রায় এক বছর ধরে আছে ; অন্ধ নন্দী সাহেবের সেই

অদ্ভুত অনুরোধের প্রথম চিঠিটাও যে প্রায় এক বছর আগে এসেছিল। সন্দেহ করতেও যে মনটা বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে যায়; অভয়দের সেকেণ্ড স্যার, প্রকাশদা নামে এই ভদ্রলোকটি সেই ভয়ংকর অনুরোধের মানুষটা নয় তো? কিন্তু মানুষ কি কখনও এমন অনুরোধ করে? চেনা-শোনা নেই, পরিচয় জানা নেই, একজন মানুষ বাণীর জীবনের একটা সংকল্পের ব্রতকে সফল করে দেবার জন্য একটা বিনাসর্ত উপকারের প্রতিজ্ঞা হয়ে কাছে আসতে চায়, এ তো একটা সাংঘাতিক ছলনার চেষ্টা আর ইচ্ছা।

অভয় বলে—প্রকাশদা কিন্তু ভয়ানক অহংকারী। তার মানে অদ্ভুত খেয়ালী। কাউকে প্রাইভেট পড়ান না। বাবা কুড়ি টাকা মাইনে সেধেছিলেন, তবু আমাকে পড়াতে রাজি হননি প্রকাশদা।

—তাই বল। হাঁপ ছাড়ে বাণী। কি যেন ভাবতে গিয়ে লজ্জা পেয়েছে বাণীর মনের মিথ্যে সন্দেহটা। বাণীর অপলক চোখের শিথিল দৃষ্টিটা চঞ্চল হয়ে হেসে ওঠে। বাণী বলে—তোমরা কিন্তু ওবাড়িতে মাঝে মাঝে যেও অভয়।

অভয়—কোন্ বাড়িতে?

বাণী হাসে—তোমদের শৈলেশদার বাড়িতে।

—কিন্তু আপনি কি আর আমাদের সঙ্গে কথা বলবার চান্স পাবেন?

—খুব পাব।

—আর পেয়েই বা লাভ কি?

—কি বললে?

—বলছিলাম···কথাটা এই যে···আমাদের কাছে আর আপনার গল্প করবার কি-ই বা থাকবে? বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা শুধু বর ছাড়া আর কারও সঙ্গে গল্প করতে চায় না।

—বেশ তো, কিন্তু তোমরা তো বলতে পারবে।

—আমরাই বা আর কি বলতে পারি?

বাণী হাসে—ধর অন্তত টাউনের ভাল-মন্দ দুটো খবর তো দিতে পারবে।

অভয়—তা পারবো।

চলে যায় অভয়। আর বাণীর দুই চোখে যেন এক খুশি দীপালির হাসি ঝিকমিক করতে থাকে।

শৈলেশ এখনও আসেনি। দশ দিন হলো বোধহয়, সেই যে সন্ধ্যা দেখা দেবার আগেই হঠাৎ একবার এসেছিল শৈলেশ, তারপর আর আসেনি। শৈলেশ নিজেই বলেছিল—এই কদিন আর আসবো না।

বাণী—কেন?

শৈলেশ—তোমাকে নতুন করে পাবো বলে। মাঝের এই দশটা দিন বাদ দিয়ে একেবারে লগ্নের ঠিক পাঁচ মিনিট আগে পৌঁছে যাব।

কথা বলতে গিয়ে হাসছিল শৈলেশ। বাণীরও মনে হয়েছিল, যেন রঙীন বিকেলের গোধূলিময় একটা ভালবাসার জগৎ হাসছে। বাণীর জীবনের সব সুখের অঙ্গীকার হাসছে। এই প্রথম জীবনে যাকে ভাল না বেসে থাকতে পারলো না বাণী, সেই মানুষটি হাসছে। মুহুরী বামাচরণবাবুর মেয়ের অসহায় জীবনটাকে করুণা করে নয়, অনুগ্রহ করে নয়; একটা গর্ব বলে মনে করেই সেই মেয়েকে চিরকালের আপন করে নিতে চেয়েছে শৈলেশ। সত্যিই তো, শৈলেশের মনটাও যেন ভোরের আকাশের মত কাঁচা আলোর মায়াতে ভরে আছে আর হাসছে। ছেলেমানুষের মনের মত যত খোলা-মেলা সাধ শখ আর ইচ্ছের মন। এই সহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট

মেয়ের স্বামী হবে শৈলেশ ; এরকম একটা সামান্য আশাকেও জীবনের একটা মস্ত গর্বের আশা করে নিয়েছে শৈলেশ।

অভয়ের কাকিমা আর বিমলের মা ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসেন—তুমি এবার ওঘরের ভিতরে গিয়ে বসো বাণী।

বাণী—কেন মাসিমা ?

অভয়ের কাকিমা মুখ টিপে হাসেন—বর আসছে। ব্যাণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছো না ?

বিমলের মা বলেন - এই বারান্দাতে বরযাত্রীরা বসবেন। কাজেই···।

সত্যিই ব্যাণ্ডের শব্দ। কোন সন্দেহ নেই, একটা মুখর উল্লাসের মিছিল এগিয়ে আসছে, সন্ধ্যার বাতাসে সেই উল্লাসের ব্যস্ততার স্বর যেন ঢেউ তুলে তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে বাণীর বুকের পাঁজরের কাছে এসে ঠেকেছে। কি আশ্চর্য, বাণীর বুকটা চমকে ওঠে, চোখ দুটো ভিজে যায়।

বিমলের মা বাণীর হাত ধরে আদরের স্বরে বলেন—চল।

ওঘরের ভিতরে একা-একা অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকবার পর বাণীর চোখে আবার খুশি দীপালির আলো জেগে ওঠে। এসেছে শৈলেশ। সারা বাড়িতে ছুটোছুটির সাড়া জেগেছে। ফটকের কাছে ব্যাণ্ডের শব্দ আরও মত্ত হয়ে উঠেছে। বিমলের মা আর অভয়ের কাকিমা মাঙ্গলিক আয়োজনের কাজে আরও ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

বাণীর জীবনের সৌভাগ্য আর ভালবাসা একসঙ্গে মিলে-মিশে উৎসব হয়ে উঠেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু বুকের ভিতরে একটা ভয় ছম ছম করে। আর, যেন কোন সাংঘাতিক মায়াহরিণের ডাক শুনতে না হয়। সেই কুৎসিত মতলবটা আর যেন একটা করুণ আহ্বান

হয়ে বাণীর মনের শান্তি নষ্ট না করে। নন্দী সাহেব লিখেছেন, সে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে চায়। এইবার তার চলে যাওয়াই তো উচিত। বাণী তো সেই আহ্বানকে ঘৃণা করে আর তুচ্ছ করে স্পষ্ট ভাষায় আপত্তির কথা জানিয়ে দিয়েছে। অভয়দের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার, ওদের ঐ প্রকাশদা'র যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে, তবে···। ছি ছি, কী বিশ্রী সন্দেহ! কে বললে সেই বিশ্রী চেষ্টাটা অভয়দের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার এই বেচারা প্রকাশেরই চেষ্টা? একটা নিরীহ মানুষকে এরকমের সন্দেহ করবার কোন মানে হয় না। জানলে শৈলেশও যে বাণীকে পাগল বলে সন্দেহ করবে।

বিমলের মা এসে বলেন—এবার তৈরী হও বাণী। পাত্রীর ডাক পড়েছে।

॥ এগার ॥

বিমল নীহার আর শেখর প্রথমে রাজী হয়নি, কিন্তু অভয়ের ইচ্ছের চাপে পড়ে শেষে রাজি হয়েছে। বিয়ে-বাড়ির নেমন্তন্নের লুচির গন্ধও ওদের আটকে রাখতে পারে নি। ওরা সোজা হেঁটে এসে সেকেণ্ড স্যার প্রকশদার ঘরে ঢুকেছে। অভয় বলে—আমরা না হয় লাষ্ট ব্যাচে খাব। তাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু…।

বিমল—কি ?

অভয়—কিন্তু প্রকাশদা এখন কি করছেন, সেটা দেখতেই পাব না, যদি দেরি করে ফেলি।

শেখর—এই তো, তুই আবার মিছিমিছি ডিটেকটিভি শুরু করলি।

অভয়—মিছিমিছি নয় ভাই।

প্রকাশ মাস্টার ঘরে নেই। ঘরের ভিতরে একটা মোমবাতি জ্বলছে। প্রকাশের বিছানার উপরে পড়ে থাকা একটা বস্তুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই অভয় চেঁচিয়ে ওঠে।—এই তো, ঠিক বুঝেছি, ঠিক ধরে ফেলেছি !

বিমল—কি ? কি ? ওটা কিরে ?

অভয়—দেখছিস না' 'মোটরবাসের টিকিট। গয়া যাবার টিকিট।

শেখর—সেই পুরনো টিকিটটা ?

অভয়—আরে না। দেখছিস না, কালকের তারিখ। ফার্স্ট সার্ভিসের টিকিট ; তার মানে কাল সকালেই গয়া চলে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন প্রকাশদা।

নীহার—এর মানে কি?

অভয়—মানে বুঝতে তোদের অনেক দেরি আছে। সে ব্রেন তোদের নেই।

বিমল—সত্যি, মা কালীর দিব্যি, কাউকে বলবো না, তুই বল অভয়।

অভয়—কি বলবো?

বিমল—এর মানে কি?

অভয়—বাণীদির গান শুনলেন, বাস্‌, এই টাউনেই রয়ে গেলেন প্রকাশদা। আবার বাণীদির যেই বিয়ে হলো, অমনি এই টাউন ছেড়ে চলে যাচ্ছেন প্রকাশদা। এর তো একটা মানে আছে ভাই।

নীহার—উঃ, তুই রবার্ট ব্লেকের চেয়েও সাংঘাতিক।

অভয়—কিন্তু প্রকাশদাকে তো চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

শেখর—আমারা কি করতে পারি বল্‌?

অভয়—আমরাই করতে পারি।

নীহার—কি করতে পারি?

অভয়—প্রকাশদাকে একটু ভুলিয়ে-ভালিয়ে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ধরে রাখতেই হবে। বুঝছিস না, হেড স্যার যদি আবার পোয়েট্রি পড়াতে শুরু করেন, তবে আমাদের কী দশা হবে?

বিমল—বুঝলাম তো, কিন্তু ··

অভয়—প্রকাশদা এখন কোথায় গেলেন, একটু খোঁজ করা দরকার।

বিমল—এখনই?

অভয়—হ্যাঁ।

কিন্তু কোথায় প্রকাশ মাস্টার? এই ছোট সহরের কোন্‌ দিকে

কোন্ প্রান্তে, কোন্ নিরালায় এখন বসে আছেন এই রহস্যময় প্রকাশদা ? কি দেখছেন, কি ভাবছেন, তাই বা কে জানে ?

বিমল বলে—মনে হচ্ছে প্রকাশদা নন্দীসাহেবের বাড়িতে বই আনতে গিয়েছেন।

অভয়—অসম্ভব। দেখছিস না, একটাও বই আর এখানে নেই। নিশ্চয় সব বই নন্দীসাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছেন প্রকাশদা। যে মানুষ কাল সকালেই গয়া চলে যাবে, সে আজ আবার বই আনতে যাবে কেন ?

শেখর—ঠিক কথা। কিন্তু···।

অভয়—ভাবলে কিছুই বুঝতে পারা যাবে না। সার্চ করে প্রকাশদাকে বের করতে হবে।

না, সার্চ করেও প্রকাশদাকে পাওয়া গেল না। যে হোটেলে খায় প্রকাশ মাষ্টার সেই হোটেলেও পাওয়া গেল না। হরিপদবাবুর গ্রামোফোনের যে দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে রেকর্ডের গান শোনে প্রকাশ সে দোকানের সামনেও প্রকাশ নেই। নন্দী সাহেবের বারান্দাতে নন্দী সাহেব একা বসে আছেন, প্রকাশ নেই। চকের কাছে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের আশে-পাশেও প্রকাশ নেই। ছোট সহরের বুকের সব বাতাসকে উতলা করে দিয়ে ব্যাণ্ডের যে শব্দ বাজছে, সেই শব্দটাই বোধহয় প্রকাশ মাষ্টারকে এক একটা ফুৎকার দিয়ে ঠেলে ঠেলে এই সহরের সীমা ছাড়িয়ে দূরের কোন নিভৃতে সরিয়ে দিয়েছে।

ঠিকই, হতাশ হয়ে আবার বিয়েবাড়ির দিকে ফিরে যাবার জন্য চার সন্ধানীর চারটে ছোট-ছোট মূর্তি যখন ক্যাথলিক গির্জার বাগানের পাঁচিলটার গায়ে হেলান দিয়ে সামনের জ্যোৎস্নাভরা খোলা ডাঙ্গা আর গয়া রোডের দু'পাশের আমের গাছের ছায়ার

ভিড়ের দিকে তাকায়, তখন দেখতে পাওয়া যায়, কে যেন সেই পথের উপর একটা আবছায়া হয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আবছায়াটা পথ থেকে নেমে ডাঙ্গার উপর একটা পাথরের উপর বসলো, যেন দূরের পাহাড়ের চূড়াটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বিমল বলে—একটা আমচোর বোধ হয়।

সন্দেহটা অহেতুক নয়। গয়া রোডের তু'পাশের আমের গাছগুলি এখন কাঁচা আমের ভারে নুয়ে পড়েছে। আমের জমাদার রফিক মিয়াঁ লাঠি হাতে নিয়ে সকাল বিকেল আর সারারাত পাহারা দিয়ে বেড়ায়; তবু আম চুরি হয়।

শেখর বলে—লোকটা আমচোর, না কবি?

হেসে ফেলে সবাই। অভয় বলে—কিন্তু প্রকাশদা তো শুধু পোয়েট্রি পড়ান, পোয়েট্রি লেখেন কি?

নীহার—হয়তো লেখেন। কে জানে?

কিন্তু সাহস করে আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেই তো হয়। কিংবা, প্রকাশদা বলে হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাক দিলেই তো হয়।

এগিয়ে যায় চার ছাত্র। কিন্তু চেঁচিয়ে ডাক দিতে হয় না। বুঝতে অসুবিধে নেই, প্রকাশদার চোখের চশমাটাকে দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, প্রকাশদাই বসে আছেন।

কাছে এগিয়ে যেয়ে অভয় বলে—আমরা আপনাকে খুঁজছি প্রকাশদা।

চমকে ওঠে, মুখ ফিরিয়ে অভয় আর তিন সঙ্গীর দিকে তাকায় প্রকাশ মাষ্টার।—তোমরা? তোমরা এখানে কেন? কিসের জন্যে? আমাকে খুঁজছো কেন?

বিমল—আপনার ঘরে গিয়ে দেখলাম আপনি নেই। তাই…।

প্রকাশ মাষ্টারের গলার স্বরে একটা বিরক্তভাব রূঢ় হয়ে

বেজে ওঠে,—তাই বলে এখানে এসে আমাকে বিরক্ত করতে হবে ?

অভয়—আপনাকে বিরক্ত করতে আসিনি প্রকাশদা।

প্রকাশ—তবে কেন এসেছো ?

অভয়—একটা দুঃখের কথা বলতে এসেছি।

প্রকাশ—কিসের দুঃখের কথা ?

অভয়—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন প্রকাশদা ?

প্রকাশ—অ্যাঁ ? কে বললে আমি চলে যাচ্ছি ?

অভয়—আপনি গয়া যাবার টিকিট কিনেছেন।

প্রকাশ—কে বললে ?

অভয়—দেখলাম, আপনার ঘরের বিছানার ওপর…।

প্রকাশ—ও…হ্যাঁ…একটা টিকিট কিনেছি বটে।

অভয়—সেই জন্যেই বলছি, আপনি যদি চলে যান তবে আমাদের পড়ার খুব ক্ষতি হবে।

প্রকাশ মাষ্টার হেসে ফেলে, আর বেশ নরম স্বরে জবাব দেয়। —তা কি-আর করবো বল ভাই, আমার চাকরিটাই যে একবছরের মেয়াদের চাকরি। হিসেব করে দেখেছি, সে মেয়াদ আজই শেষ হয়েছে। কাজেই, আমার আর এখানে থাকবার মানে হয় না।

অভয়—কিন্তু…।

প্রকাশ মাষ্টারের গলার স্বর এইবার যেন করুণ হয়ে কেঁপে ওঠে।—কিন্তু তোমাদের দুঃখ করার দরকার হয় না অভয়। টেম্পোরারি চাকরির এই তো নিয়ম। শুধু দুদিনের পালা।

অভয়—কিন্তু আপনি এভাবে একেবারে সায়লেণ্টলি চলে যাবেন কেন ? আমারই বা সায়লেণ্টলি আপনাকে চলে যেতে দেব কেন ?

প্রকাশ—বুঝলাম না।

অভয়—জলধর স্যারের যেমন ফেয়ারওয়েল হয়েছিল, আপনারও তেমনি ফেয়ারওয়েল হবে।

প্রকাশ হাসে—এই তো ভাল ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল।

নীহার—কি বললেন স্যার ?

প্রকাশ—এই যে তোমরা চারজন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ।

অভয়—না প্রকাশদা। এ'তে হয় না। আপনাকে আমরা সভা করে ফেয়ারওয়েল দেব।

চেঁচিয়ে হেসে ওঠে প্রকাশ মাষ্টার—সভা! ওরে বাবা! কোন দরকার নেই।

অভয়—দরকার আছে প্রকাশদা।

প্রকাশ—না; ও সভাতে কোন ভদ্রলোকের আসতে সাহস হবে না।

অভয়—কেউ না আসুক, অন্তত বাণীদি তো আসবেন।

প্রকাশ—কি বললে ?

অভয়—অন্তত বাণীদিকে আমরা জোর করে আনতে পারবো; আর, বাণীদিকে দিয়ে সেই গানটাও গাওয়াতে পারবো। দিনগুলি মোর···।

প্রকাশ মাষ্টারের মূর্তিটা হঠাৎ যেন সব নিঃশ্বাসের চাঞ্চল্য হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। দূরের পাহাড়ের নিরেট আর ভরাট পাথুরে চূড়াটার দিকে তাকাতে গিয়ে আকাশের ছোট চাঁদটার দিকে তাকিয়ে ফেলেছে প্রকাশ মাষ্টার।
তাই চোখ দুটোও চিকচিক করছে।

শেখর বলে—আপনি তাহলে কালই চলে যাবেন না স্যার।

বিমল বলে—আপনি অন্তত আর সাতটা দিন থাকুন প্রকাশদা।

নীহার বলে—ফেয়ারওয়েলের জন্য চাঁদা তুলতে তো আমাদের চারটে দিন লাগবে স্যার।

প্রকাশ মাস্টার ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়।—আচ্ছা।

॥ বার ॥

কলকাতা থেকে এসেছিল যে ডেকোরেটর, সে তার রঙীন বেলোয়ারীর বাতি আর চাঁদমালার স্তূপ সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ফিরে গিয়েছে। উৎসব শেষ হয়েছে। ছোট সহরটার উপরে এই কদিন ধরে যেন একটা ব্যাকুল বসন্ত বাতাসের ঝড় বয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন সব শান্ত। বাণীর সৌভাগ্য নিয়ে মেয়ে মহলে আলোচনাব ব্যাকুলতাও থিতিয়ে এসেছে। বাণীর পিসিমা ছুমকা ফিরে গিয়েছেন। বামাচরণ বাবুর সেই সামান্য চেহারার বাড়িটার সামনে পাঁচিলের গা ঘেঁষে টকপেয়ারার গাছটা একেবারে একলা হয়ে রাতের বাতাসে গা তুলিয়ে মট্‌মট্‌ শব্দ করে। এ বাড়িতে আর বাতি জ্বলে না। বাড়ির সব জানালা আর দরজার কপাট বন্ধ। বারান্দাতে নিরেট অন্ধকার।

কিন্তু শৈলেশের দোতলা বাড়ির একটি ঘরের খোলা জানালা মাঝরাত পর্যন্ত নতুন আলোর খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে হাসে। বাঁশের জাফরি বেয়ে আইভি লতার দল জানালার গোড়া পর্যন্ত লতিয়ে উঠেছে আর ঝাঁকড়া হয়ে ঝুলে পড়েছে। সেই লতার উপর দিনের বেলায় শত শত রঙীন ফড়িং উড়ে বেড়ায়; আর সন্ধ্যা হলেই ঘরের ভিতর থেকে নতুন একটা রঙীন বাতির লতার উপর আলো ছড়িয়ে পড়ে। বুঝতে অসুবিধে নেই, ঐ ঘরের ভিতরে একটা উৎসব চিরন্তন হয়ে গিয়েছে।

ছুদিন সন্ধ্যাবেলা বাণীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য শৈলেশের এই বাড়ির ফটক পর্যন্ত এসেই ফিরে গিয়েছে অভয় আর বিমল, নীহার আর শেখর। দোতলার এই ঘরের জানালাটার দিকে

তাকাতে গিয়ে ওরা বেশ আশ্চর্যও হয়েছে। ঐ ঘরের ভিতরে রঙীন আলোর একটা স্বপ্নপুরীর মধ্যে বাণীদি বসে আছেন। ইস্, মানুষের অবস্থার কী অদ্ভুত চেঞ্জ হয়ে যায় রে বিমল! ফিসফিস করে অভয়। বিমল বলে—বাণীদি আর আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা কে জানে?

ওরা এসেছিল বাণীদির কাছে এসে প্রকাশ মাস্টারের ফেয়ারওয়েলের কথাটা বলতে; সেই ফেয়ারওয়েলে বাণীদিকে গান গাইতে রাজি করাতে। আর, বাণীদির কাছ থেকে কিছু চাঁদাও আদায় করতে।

প্রকাশ মাস্টারের বিদায় সম্বর্ধনার জন্য চার ছাত্রের মাথায় যে-সব প্ল্যান দেখা দিয়েছে, তার কিছু খবর ওরা এরই মধ্যে প্রচার করে ফেলেছে। হেড স্যারও কিছু শুনেছেন। তিনি দুঃখ করেছেন, প্রকাশ মাস্টার কেন আর স্কুলে আসছে না; একটা চিঠি দিয়েও কোন কথা জানাচ্ছে না। যদি চলেই যাবে প্রকাশ মাস্টার, তবে অন্তত ভদ্রতার খাতিরে একবার সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে সে-কথা জানিয়ে আসা উচিত ছিল। সে-সব না করে, কয়েকটা চ্যাংড়া ছাত্রকে দিয়ে বিদায়-সভা করাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে প্রকাশ, এটাই বা কেমনতর ব্যাপার? ছেলেগুলো সেক্রেটারীর বাড়িতে দু'বার গিয়েছিল। ওরা সেক্রেটারীকে কথাটা বলেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সেক্রেটারীই বা কি বললেন, এখনও জানতে পারেননি হেড স্যার। এটাও ঠিক, সেক্রেটারী যদি না বলেন, তবে প্রকাশ মাস্টারের বিদায়-সভার জন্যে চাঁদা দেওয়া উচিত হবে না। ছোঁড়ারা অবশ্য একটা আশ্চর্য কথা বলছে: প্রকাশ মাস্টারের বিদায় সভাতে সেক্রেটারীর স্ত্রী বাণীই নাকি গান গাইবে। ব্যাপারটা যে সত্যিই একটা ধাঁধাঁ।

প্রকাশ মাস্টার মাত্র সাতটা দিনের অপেক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে; এরই মধ্যে ফেয়ারওয়েল সেরে ফেলতে হবে; কিন্তু পাঁচটা দিন যে পার হয়েই গেল। আর মাত্র তুটো দিন হাতে আছে। এর মধ্যে, সত্যিই তো, কী যে ব্যবস্থা করা হবে আর কেমন করে হবে, ভাবতে গিয়ে চার সুহৃদের তুশ্চিন্তাও ছটফট করে উঠতে থাকে। আর দেরি করলে চলবে না, বাণীদির সঙ্গে দেখা করতেই হবে, প্রকাশদার ফেয়ারওয়েলের কথাটা বলতে হবে, গান গাইতে রাজি করাতেই হবে আর চাঁদা নিতেই হবে। তারপর আর কোন সন্দেহ থাকবে না যে, সেক্রেটারী শৈলেশদাও রাজি হয়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে সব স্যারও চাঁদা দিতে রাজি হয়ে যাবেন। প্রকাশদার বিদায়-সভাতে বেশ ভিড় হবে। দীননাথবাবু নিশ্চয় চমৎকার একটা তুঃখের বক্তৃতা করবেন।

আবার সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়ির ফটকের কাছে চার ছাত্রের জটলা ফিসফিস করে আলোচনা করে।—ঐ যে, জানালাতে বাণীদিকে দেখা যাচ্ছে।

—তবে চল।

—আগে হাত তুলে বাণীদিকে একটা ইসারা কর।

কিন্তু ইসারা করতে আর হলো না। পিছন থেকে যেন একটা সহাস্য প্রশ্নের কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে।—কি ব্যাপার? তোমাদের মতলব কি?

অভয়—আমরা একটা খুব দরকারী কাজে এসেছি শৈলেশদা।

শৈলেশ—বল।

অভয়—সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকে একটা ফেয়ারওয়েল দেবার জন্যে আমরা···।

—কে? কিসের ফেয়ারওয়েল? কার জন্যে ফেয়ারওয়েল?

শৈলেশের গলার স্বরে যেন একটা বিস্ময়ের রাগ চমকে ওঠে।

বিমল—প্রকাশদা চলে যাচ্ছেন, তাই···।

শৈলেশ—কে বললে ?

নীহার—প্রকাশদা বললেন, একবছরের চাকরী শেষ হয়েছে, তাই উনি চলে যাবেন।

শৈলেশ—কিন্তু আমি তো এখনও প্রকাশ মাস্টারকে চলে যেতে বলিনি।

শেখর—প্রকাশদা কিন্তু···।

চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ—না, কোন কিন্তু-টিন্তু নেই। এসব প্রকাশ মাস্টারের একটা চালাকি! এমন চালাকির কোন দরকার ছিল না।

অভয়—ফেয়ারওয়েল তাহলে···।

শৈলেশ—না।

বিমল—আমরা তবে···।

শৈলেশ—না, তোমাদের এসব বাজে কাজে মাথা ঘামাতে হবে না। বরং, এক্ষুনি গিয়ে প্রকাশ মাস্টারকে গিয়ে বল, যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

॥ তের ॥

দোতলার ঘরের জানালার কাছে আইভিলতার পাতার স্তবক খুশির বাতাসে কাঁপছে; শৈলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বাণীর চোখের হাসিটাও যেন এই খুশির বাতাসের ছোঁয়া পেয়ে কাঁপতে থাকে।

শৈলেশ বলে—এ কদিনের মধ্যে তুমি কত নতুন কথাই না বললে বাণী, কিন্তু মনে হচ্ছে, একটা পুরনো কথাকে একেবারে ভুলে গিয়েছ।

বাণী—পুরনো কথা?

শৈলেশ—হ্যাঁ।

বাণী—কি?

শৈলেশ—কই, একবারও তো বললে না যে, এইবার তোমার বি-এ পড়বার ব্যবস্থাটা করতে হয়।

বাণীর কালো চোখের তারাদুটো যেন আরও খুশি হয়ে হাসতে থাকে।—সেটা আর আমি বলতে যাব কেন? যে আমার ভার নিয়েছে, সে-ই বলবে।

শৈলেশ—কেন? তোমার কি বি-এ পড়বার আর কোন আগ্রহ নেই?

বাণী—আছে বইকি। কিন্তু তোমার আগ্রহ আর আছে কিনা, বুঝতে পারছি না।

বাণীর চোখের হাসিতে যেন ভালবাসারই একটা সুন্দর ধূর্ততা চিকচিক করছে।

শৈলেশ বলে—একথার মানে কি? আমি কি তাহ'লে তোমাকে

একটা ধাপ্পা দিয়ে···তার মানে তোমাকে শুধু বিয়ে করবার জন্যেই একটা ধাপ্পা দিয়েছি।

বাণী হাসে—আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছি ···।

শৈলেশ—কি ?

বাণী—আমি বিশ্বাস করেছি, তুমি ভালবেসেই আমাকে বিয়ে করেছ।

শৈলেশ হাসে—একই কথা হলো। এর মানে, তুমি বলতে চাও, এখন তুমি বি-এ না পড়লেও আমার কোন আপত্তি নেই।

বাণী—তাই তো মনে হয়।

শৈলেশ—না। বরং সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই···।

শৈলেশের কাছে আরও সরে এসে, শৈলেশের কাঁধের কাছে মাথাটাকে হেলিয়ে দিয়ে বাণী বলে—ঠিক কথা। সন্দেহ করবার দরকার নেই। আমার আর বি-এ না পড়লেও চলবে।

—কেন ?

—বি-এ পাস করে আমার আর কি-এমন গৌরবটা বাড়বে। তুমি আমার স্বামী, এই যথেষ্ট।

শৈলেশ—কিন্তু আমার তো তাতে পোষাবে না।

বাণী—কি বললে ?

শৈলেশ—আমার স্ত্রী হবে এই সহরের প্রথম মেয়ে গ্র্যাজুয়েট ; এ না হলে আমার চলবে না। এ না হলে আমার গর্ব খুশি হবে না।

শৈলেশের কথার ব্যস্ততা হঠাৎ যেন থমকে যায়। বাণীর চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে।—এ কি ? আমার কথার মধ্যে কি কোন···।

বাণীও ব্যস্ত ভাবে বলে—না না। তুমি কিছু মনে করো না। হয়তো আমিই ভুল করে অন্য কথা ভেবেছি।

শৈলেশ বলে—লোকে যদি বলে, আমি বামাচরণ বাবুর মেয়েকে বিয়ে করেছি, তবে সেটা কি আমার পক্ষে খুব একটা…।

বাণীর ঝাপ্‌সা চোখের দৃষ্টিটা এইবার যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।—বুঝেছি, সেটা তোমার পক্ষে কোন গৌরবের কথাই নয়। কিন্তু তুমি দয়া করে বামাচরণবাবুর মত মানুষের মেয়েকে ভাল-বেসেছ আর বিয়ে করেছ, এটা তো তোমার পক্ষে গৌরবের কথা।

শৈলেশ—হতে পারে। কিন্তু পাঁচজনের কাছে যেটা…।

বাণী—কি ?

শৈলেশ—সুদাসবাবু আজই বার লাইব্রেরীর ঘরে বসে হাসাহাসি করে বেশ একটা গর্বের কথা সবাইকে বলছিলেন। কথাটা আমার পক্ষে একটু…।

বাণী—কি ?

শৈলেশ—সুদাসবাবু বলছিলেন, বিদুষী কামিনী যায় যদি আর বছর তিন পরে এ সহরে আসেন, তবে দেখতে পাবেন যে, সুদাস-বাবুর মেয়ে শুভেশ্বরীই হলো এই সহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। কলেজে পড়বার জন্যে শুভেশ্বরীকে পাটনাতে পাঠিয়েছেন সুদাসবাবু।

বাণী বিব্রতভাবে বলে—কিন্তু এতে তোমার পক্ষে…।

শৈলেশ—এতে আমাকেই ঠাট্টা করেছেন সুদাসবাবু। ওঁর ধারণা, মনে হচ্ছে আরও অনেকেরই ধারণা এই যে, বামাচরণবাবুর মেয়ে বাণীর আর বি-এ পড়া হবে না। অর্থাৎ আমিই তোমাকে বিয়ে করে তোমার বি-এ পড়বার স্বপ্ন নষ্ট করে দিয়েছি।

বাণী—ওদের একটা মিথ্যে ধারণার জন্যে তুমি দুঃখিত হবে কেন ?

শৈলেশ—দুঃখিত হইনি, কিন্তু ওদের ধারণাটাকে জব্দ করা দরকার।

বাণী—বেশ তো, আমি পড়বো, তুমি ব্যবস্থা কর।

শৈলেশ—কলকাতায় কলেজ হোষ্টেলে থেকে পড়বে?

বাণী হেসে ফেলে—না, তা হবে না।

শৈলেশ—তবে?

বাণী—আমি এখানেই, তোমার কাছে থেকেই পড়বো।

শৈলেশ—আমার কাছে থাকলে কি পড়া হবে, না সব পড়া চুলোয় যাবে?

বাণী—কেন চুলোয় যাবে?

শৈলেশ—কেন চুলোয় যাবে না?

বাণী—তুমিই পড়াবে।

শৈলেশ—তা হলেই হয়েছে। তা হলে আর তোমার বি-এ পাস করতে হবে না।

—কেন?

—কি আশ্চর্য? তোমাকে বই পড়ানো কি আমার পক্ষে আর সম্ভব হতে পারে? তোমার এই মুখটি আমার চোখের কাছে থাকলে বইয়ের পাতার দিকে আমি তাকাবো কি করে, অসম্ভব। সব চেয়ে ভাল হয়, যদি......

বাণী—বল।

শৈলেশ—খুব ভাল পড়াতে পারে, এমন একজন মাস্টারের কাছে যদি পড়।

বাণী—কোন দরকার নেই।

শৈলেশ—দরকার আছে বাণী। সত্যিই এরকম একজন মাস্টার পাওয়াও যাচ্ছে।

বাণী—কে ?

শৈলেশ—আমারই স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার প্রকাশ। লোকটা অবিশ্যি একটা…যাক্ সে সব কথা, আমাদের কাজ নিয়ে কাজ।

বাণীর নিঃশ্বাসের বাতাস যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

শৈলেশ—তুমি লোকটাকে কখনও দেখনি ?

বাণী—কাকে ?

—প্রকাশ মাস্টারকে ?

—না।

—দেখেছো বোধ হয়, মনে পড়ছে না।

—দেখে থাকলেও চিনি না।

—বুড়ো জলধরবাবুর ফেয়ারওয়েলের সভাতে আমি লোকটাকে প্রথম দেখেছিলাম।

—সে সভাতে আমিই তো গান গেয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই মনে হচ্ছে, প্রকাশ মাস্টার তোমাকে চেনে।

—হতে পারে।

—যাই হোক, তুমি রাজি কিনা বল।

—তুমি রাজি হলেই আমি রাজি। কিন্তু…

—কি ?

—প্রকাশবাবু কি রাজি হবেন ?

—তোমার আবার এ সন্দেহ হলো কেন ?

—মনে পড়ছে, একদিন বিমল কিংবা অভয় বলেছিল, প্রকাশ মাস্টার কোন ছাত্রকে প্রাইভেট পড়াতে রাজি হননি। তিনি নিজেই নিজের পড়াশোনা নিয়ে সব সময় ব্যস্ত।

—বাজে কথা। এই মাসেই আমার কাছে আরজি করতে আসবে প্রকাশ মাস্টার।

—কিসের আরজি?

—চাকরির মেয়াদ বাড়াবার জন্যে। কিংবা পার্মানেন্ট হবার জন্যে। নয়তো মাইনে বাড়াবার জন্যে। আমি তো ওকে মাত্র এক বছরের জন্যে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়েছিলাম।

—কিন্তু প্রাইভেট পড়াতে রাজি হবেন কিনা, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না।

—রাজি না হয়ে যাবে কোথায়? রাজি না হলে ওর চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে আমিও রাজি হব না।

—দেখ তা হলে। কিন্তু···

—আবার কিন্তু কিসের?

—খুশি হয়ে রাজি না হলে কাউকে চাপ দিয়ে কাজ করালে তাতে কোন লাভ হবে না। তা ছাড়া, এটা হলো পড়াবার কাজ; অনিচ্ছায় আর যে কাজই চলুক না কেন, পড়ানোর কাজ চলে না।

—অনিচ্ছা করবে কেন প্রকাশ মাস্টার? বলা মাত্র খুশি হয়ে রাজি হবে। তাছাড়া এসব লোককে চাপ দিলেই বরং ভাল কাজ পাওয়া যায়।

॥ চৌদ্দ ॥

শৈলেশের বাড়ির বাইরের ঘর। প্রকাশ মাস্টার এসেছে। শৈলেশ কোন প্রশ্ন করবার আগেই হাসিমুখে বলে ফেলেছে প্রকাশ—ঠিকই, চলে যাবার আগে আপনাকে একবার জানানো উচিত। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভালই করেছেন। আমি যাই, আমাকে বিদায় দিন।

প্রকাশ মাস্টার নিজেই এসে বলছে, বিদায় দিন। শৈলেশের কল্পনার আনন্দটা যেন হঠাৎ জব্দ হয়ে গিয়েছে। চলেই যাচ্ছে যে, তাকে আর চাপ দেবার উপায় কোথায়? যার কোন দাবী নেই তাকে বিমুখ করবার ভয় দেখবারও যে উপায় নেই।

শৈলেশ বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন কেন?

প্রকাশ—আমার তো চলে যাবারই কথা।

শৈলেশ—যদি আরও দু বছর এক্সটেনসন দিই; তবে তো চলে যাবেন না?

প্রকাশ—কি দরকার? এই এক বছর তো বেশ কাটিয়ে গেলাম। আর কেন?

—নিশ্চয় অন্য কোথাও এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের একটা কাজ জুটিয়েছেন?

—আজ্ঞে না।

—তবে?

—তবে জুটিয়ে নিতে পারবো বলে আশা করছি। এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের না হোক, অন্তত কম মাইনের একটা কাজ পেয়েই যাব বোধহয়।

কত শান্ত স্বরে আর কত মৃদু হাসি হেসে কথা বলছে প্রকাশ মাস্টার। কিন্তু বুঝতে পারছে না নিশ্চয়, সেক্রেটারীর মনের যত উদ্ধত যুক্তি-বুদ্ধি সবই কি-ভয়ানক একটা যন্ত্রণা সহ্য করতে গিয়ে নিঃশব্দে ছটফট করছে। একটু মহৎ হয়ে, একটু উদার হয়ে, আর একটু কৃপাপরবশ হয়ে কথা বলতে চাইছেন সেক্রেটারী; কিন্তু ত্রিশ টাকা মাইনের এক খামখেয়ালী টিচার যেন সাংঘাতিক একটা কৌতুকের তুক করে সেক্রেটারীর মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে।

শৈলেশ বলে—আমার ইচ্ছা আপনি অন্তত আরও ছুটো বছর থাকুন।

প্রকাশ যেন মিনতি করে বলে—আজ্ঞে না, ছেড়ে দিন; আপনি আর এমন ইচ্ছে করবেন না।

শৈলেশ—আপনারই একটা সুবিধে হবে।

প্রকাশ যেন আশ্চর্য হয়ে যায়।—আমার সুবিধে?

—হ্যাঁ।

—কি?

এইবার যেন নিঃশ্বাসের সব শক্তি নিয়ে আর জোর করে হেসে ফেলে শৈলেশ।—আপনার কিছু উপরি আয় হবে, এমন একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—দরকার নেই।

—তবুও বলছেন দরকার নেই?

—না। আপনি কিছু মনে করবেন না। আমার এখন এখান থেকে চলে যেতেই ভাল লাগছে।

—কিন্তু আমার যে এখন আপনাকে ছেড়ে দিতে ভাল লাগছে না।

—কেন বলুন তো?

—একটা দরকার ছিল।

—আপনার দরকার ?

—হ্যাঁ।

—তাহলে বলুন। যদি সম্ভব হয়, তবে আমি থেকে যাব।

—আমার স্ত্রী বি-এ পড়তে চান। তাঁরই জন্যে টিউটর দরকার। আমার মনে হয়েছে, আপনি পড়ালে ভাল হবে।

—মাপ করবেন। এসব কাজ আর আমার ভাল লাগেবে না।

—ভাল টাকা পেলেও কি পড়াবেন না ?

—ভাল টাকা মানে কত টাকা ?

—ধরুন পঞ্চাশ টাকা।

—আপনার কথায় রাজি হতে পারলে আমি নিজেও খুশি হতাম। কিন্তু পারবো না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

—কিন্তু আমি যে আমার স্ত্রীর কাছে একেবারে স্পষ্ট করে বলেছি যে, আপনি খুশি হয়ে পড়াতে রাজি হবেন, পড়াবেন। আর সে'ও আশা করে বসে আছে।

প্রকাশ মাস্টারের চোখ তুটো বিপন্ন মানুষের চোখের মত করুণ হয়ে যায়। আবার, যেন আতঙ্কিতের মত একবার চমকেও ওঠে। আবার, আনমনা মানুষের চোখের মত হঠাৎ উদাস হয়ে যায়।

আর সেক্রেটারী শৈলেশের মাথাটা একটু ঝুঁকে পড়েছে ; কি যেন ভাবছে শৈলেশ। যেন একটা আহত প্রেস্টিজের বিনত আক্রোশ, একটা গরজের বিনয় যেন জোর করে একটা হুংকার চেপে রেখে নম্রস্বরে কথা বলতে চেষ্টা করছে। ভাবতে একটা তুঃসহ শাস্তির মতই লাগছে। সহ্যও করতে হচ্ছে ; তা না হলে বাণীর কাছে এত জোর গলা ক'রে বলা সেইসব কথা, সেই মুখর প্রতিশ্রুতির সব সম্মান যে মিথ্যে হয়ে যাবে। বাণীও হয়তো

ভুল বুঝবে, কিংবা কিছু না বুঝেও মুখে কিছু বলবে না। কিংবা শৈলেশকে বোধ হয় একটা অসার হামবড়াই বলে মনে করে আড়ালে হেসে ফেলবে। তাই, উপায় নেই বলেই, দুরন্ত ঘৃণার জ্বালাটাকে চাপা দিয়ে প্রকাশ মাস্টারকে বিনীত ভাষায় অনুরোধ করতে হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, এই প্রকাশ মাস্টার যদি বাণীকে পড়ায়; তবে বি-এ পাশ করতে বাণীর কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু কী ধূর্ত এই প্রকাশ মাস্টার; আর কী সাংঘাতিক লোকটার বিদ্যাবত্তার অহংকার, যেন সেক্রেটারী শৈলেশের অপ্রস্তুত অবস্থার শাস্তিটাকে আরও দুঃসহ করে দেবার জন্য এখনও চুপ করে ভাবছে।

—বলুন, কি বলতে চান? রুক্ষ রূঢ় আর অপ্রসন্ন স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ।

চমকে ওঠে প্রকাশ। কিন্তু সেই মুহূর্তেই যেন একেবারে শান্ত হয়ে গিয়ে প্রকাশ মাস্টারের চোখ দুটো হেসে ওঠে।—আমি রাজি; শুধু একটু ভেবে নিলাম। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

॥ পনের ॥

হেডমাস্টার রাখালবাবু এইবার যে বেশ উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সেটা এরই মধ্যে ধরে ফেলতে পেরেছেন টিচারেরা আর পণ্ডিত মশাইয়েরা। টিচারদের মেসবাড়ির বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে তামাকের ধোঁয়াও তাই বেশ প্রসন্ন হয়ে ফুরফুর করে। এবার তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে, প্রকাশ মাস্টারের উপর সেক্রেটারীর বিশেষ সুনজর আছে। প্রকাশ মাস্টার আরও দু' বছর এক্সটেনসন পেল, তা ছাড়া সেক্রেটারীর স্ত্রীকে পড়াবার মত একটা গুরুভার দায়িত্বও পেয়ে গেল ; এসব তো রাখালবাবুর ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল লক্ষণ নয়।

থার্ড টিচার অনন্তবাবুর কাছে একদিন উদ্বেগের কথাটা বলেই ফেলেছেন হেডমাস্টার রাখালবাবু।—মনে হচ্ছে, আমার মেয়াদও আর মাত্র দু'বছর।

—কেন এরকম মনে হচ্ছে আপনার ?

—সেক্রেটারীর স্ত্রী বি-এ পাশ করতে যতদিন বাকি, ততদিন আমিও আছি। তারপর আর নয়।

—তার মানে ?

রাখালবাবুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরও যেন একটা রাগ চাপতে গিয়ে ছটফট করে ওঠে।—মানে বুঝতে না পারলে ডিকসনারি দেখুন।

—আজ্ঞে···।

—মানে বুঝতে এত দেরি করেন কেন মশাই ? মানে হলো, প্রকাশ মাস্টার এবার তার প্রসপেক্ট বুঝতে পেরেছে। সেক্রেটারীর

স্ত্রী বি-এ পাশ করলেই যে পুরস্কারটা পাবে প্রকাশ, সেটা কি অনুমান করতে পারছেন না?

—ঠিক পারছি না।

—আমাকে কচু বনে গিয়ে বাস করতে হবে, আর আপনাদের হেড হবেন ঐ ছোকরা প্রকাশ। নিতান্ত একটা আধুনিক বি-এ, না হয় কয়েকটা আউট-বুক পড়েছে; তাকে একটা মহামহোপাধ্যায় বলে মনে ক'রে এতটা লাই দেওয়া কি উচিত হচ্ছে?

—না না; আপনি একটু বাড়িয়ে ভাবছেন। উদ্বিগ্ন আর সন্দিগ্ধ রাখালবাবুকে একটা সান্ত্বনার ভাষা শুনিয়ে দিতে গিয়েও থার্ড টিচারের মুখটা অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে।

সেই হাসি মেসবাড়ির এই বারান্দায় সন্ধ্যার অন্ধকারে প্রায় রোজই উচ্ছল হয়ে বাজে। মনে হয়, রাখালবাবু যত উদ্বিগ্ন হবেন, এই বারান্দায় সান্ধ্য হাসিটা তত উচ্ছল হয়ে উঠবে।

কিন্তু মেসবাড়ির এই সান্ধ্য প্রসন্নতাকে বেশ বিষণ্ণ করে দেবার মত আর-একটা চিন্তা আছে। এবং এই চিন্তাটাই এসে মেসবাড়ির তামাকের সান্ধ্য ধোঁয়াটাকে বেশ বিষণ্ণ করে দেয়, যেন একটু থিতিয়ে দেয়। সে ধোঁয়া আর ফুরফুর করে না।

ফোর্থ টিচার বিষ্ণুবাবু বলেন—রাখালবাবুর হেড কাটা যাবে, সেটা না হয় মেনে নেওয়াই হলো। তাই বলে প্রকাশ মাস্টারের হেড তুলে ধরতে হবে কেন? এটা ভাল করছেন না সেক্রেটারী। বিজ্ঞাপন দিলে অনেক ভাল আর অনেক যোগ্য হেডমাস্টার পাওয়া যায়।

অধর পণ্ডিত বলেন—আমার কিন্তু সব ব্যাপারটাই ধাঁধার মত মনে হচ্ছে।

—কেন?

—কেন নয় বলুন ? কাউকে প্রাইভেট পড়াবে না বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল যে মানুষ, সে হঠাৎ এক মহিলার প্রাইভেট টিউটর হতে চট করে রাজি হয়ে যায় কেন ?

—হুঁ, এটা ভাববার মত কথা বটে।

—তা ছাড়া আরও একটা কথা, মাপ করবেন আপনারা, প্রকাশ মাস্টার যে একটা অবিবাহিত যুবক, এটা তো সেক্রেটারীর অজানা নয় ?

—খুব জানেন।

—তবে ?

—আমার তো আরও একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

—কি ?

—সেক্রেটারী না হয় একটু বেশি রকমের উদার মানুষ। কিন্তু মহিলা কি বলে রাজি হলেন ? ওঁর তো আপত্তি করা উচিত ছিল।

—আশ্চর্য !

অভয়কেও একদিন বলতে হয়েছে—আশ্চর্য !

দিনটা রবিবার; সেই জন্যেই ক্লাস এইটের বিমল অভয় নীহার আর শেখর সকালবেলাতে বেড়াতে বের হয়েছে। টাউনের ধুলো-ছড়ানো সড়ক যেখানে শেষ হয়েছে, আর ঝকঝকে সাদা কাঁকরের রাস্তা দু' পাশে আমের আর নিমের ছায়া নিয়ে সেখান থেকে শুরু হয়ে দূরের পাহাড় আর শালবনের দিকে চলে গিয়েছে, সেখানে চমৎকার একটা লাল মাটির ডাঙ্গা আছে। ডাঙ্গাটা মিঠে খেজুরের জন্যে বিখ্যাত। তা ছাড়া ডাঙ্গাটা দেখতেও বড় সুন্দর। রাস্তার গা থেকে ডাঙ্গাটা একটানা ঢালু হয়ে ছোট একটা ঝর্ণা-নদীর কাছে এসে শেষ হয়েছে। সে ঝর্ণানদীর কিনারায় অনেক-গুলো ছোট-ছোট সমাধি আর শ্বেতকরবী।

প্রকাশদা বোধহয় একটু কবি-মনের মানুষ। তা না হলে, মাঝে মাঝে এই ডাঙ্গাটার উপরে একা-একা ঘুরে বেড়াবেন কেন? নিশ্চয় মিঠে খেজুরের লোভে নয়, কোন সন্দেহ নেই, ডাঙ্গার এই চমৎকার লাল মাটি, কালো পাথর, সাদা কাঁকর আর সবুজ ঘাস দেখতে, আর, ঝর্ণানদীটার কলকল শব্দ আর শ্বেতকরবীর ঝোপের দুর্গা-টুনটুনির ডাক শুনতে আসেন প্রকাশদা।

ঢিল মেরে অনেক মিঠে খেজুর নামিয়ে আর খেয়ে, তারপর ঘাসের উপর লুটিয়ে পড়ে যখন হাঁপ ছাড়ে বিমল, তখন অভয়ও হাঁপ ছাড়তে গিয়ে বলে ওঠে।—আশ্চর্য।

—কিসের আশ্চর্য?

—প্রকাশদা আমাকে পড়াতে রাজি হলেন না ; কিন্তু বাণীদিকে পড়াতে রাজি হয়ে গেলেন।

—বোধহয় ভাল টাকা দিচ্ছেন শৈলেশদা।

—কে জানে! বাবাও তো প্রকাশদাকে ভাল টাকা দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তবু তো রাজি হননি।

—কেন রাজি হননি?

—বলেছিলেন, প্রাইভেট পড়াতে ভাল লাগে না।

—কেন ভাল লাগে না?

—বলেছিলেন, একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

—নিরিবিলি কেন?

—সেটা আমি কি করে বলবো? আমি তো কারও অন্তর্যামী নই।

চমকে ওঠে নীহার—চুপ।

—কেন?

—প্রকাশদা আসছেন।

হ্যাঁ, প্রকাশদাই আসছেন। কিন্তু একা নন। সঙ্গে রয়েছেন আর-একজন মানুষ, যাঁর বাড়িটাকে এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়। ঐ যে, মেহেদি গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়িটা অনেকগুলো দেবদারুর ছায়ার কাছে ঝলমল করছে। বিখ্যাত বিদ্বান পি কে রায় ঐ বাড়িতে থাকেন। অভয়ের বাবা বলেছেন, ওরকম বিদ্বান মানুষ খুব কমই আছে। লজিকের অনেক বই লিখেছেন। এডিনবরার যত ছাত্র আর প্রফেসার একদিন এই পি কে রায়ের প্রতিভা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের স্কুল থেকে শুরু করে এডিনবরা, কোন পরীক্ষায় সেকেণ্ড হন নি পি কে রায়। পি কে রায় হলেন চিরকালের ফার্স্ট।

প্যাণ্ট কোট আর টুপি, সাহেবী সাজে সেজে থাকেন, আর বেতের একটি স্টিক হাতে নিয়ে সকাল-বিকাল এদিকের রাস্তায় রোজই আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়ান এই বিদ্বান বুড়ো-মানুষ পি কে রায়। বিমল অভয় নীহার আর শেখর একদিন বিকালে সাহস করে বলেই ফেলেছিল—গুড মর্নিং স্যার।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিলেন পি কে রায়। সাংঘাতিক গভীর স্বরে বলেছিলেন।—শোন।

—আজ্ঞে ?

পি কে রায়—বল নমস্কার।

—নমস্কার। নমস্কার।

তারপরেই হেসে উঠেছিলেন পি কে রায়। নীহারের মাথায় হাত বোলালেন, অভয়কে গাল টিপে আদর করলেন। তারপরেই বললেন—তোমরা বিকেলবেলা খেলা কর না ?

—করি।

—তবে এখন এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন ?

—এমনি।

—না, এই অভ্যেস ভাল নয়। খেলবে, দৌড়বে, গাছে চড়বে। মোট কথা, শরীর মজবুত করা চাই, স্বাস্থ্যও ভাল করা চাই।

—যে আজ্ঞে।

—মনে রেখ, মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো।

সেদিন, সেই বিকালেই প্রকাশ মাস্টারের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল অভয় আর বিমল, শেখর আর নীহার।—কথাটার মানে কি প্রকাশদা?

—কি কথা?

—বিদ্বান পি কে রায় বললেন, মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো।

—মানে হলো, সুস্থ দেহ সুস্থ মন। শরীর সুস্থ থাকলেই মন সুস্থ থাকে। তোমাদের ভালর জন্যই খুব ভাল একটা উপদেশ দিয়েছেন পি কে রায়। উপদেশটা মনে রেখ।

—হ্যাঁ, প্রকাশদা।

বিদ্বান বুড়ো-মানুষ পি কে রায়কে দেখে আর তাঁর বিদ্যার গল্প শুনে আশ্চর্য হয়েছিল যারা, তারা সেদিন তাদের সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদাকেও যেন নতুন আশ্চর্য বলে মনে করেছিল।

সেই প্রকাশদা আসছেন; সেই পি কে রায়ও সঙ্গে সঙ্গে আসছেন। মনের ভেতরে 'মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো' উপদেশটাও যেন কথা বলছে। কিন্তু এখনই যে একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে যেতে হবে। ঘাসের উপর অলস হয়ে লুটিয়ে বসে থাকবার যে কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যাবে না।

দৌড় দিয়ে ছুটে পালিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু বিমল বলে—লুকিয়ে পড়া যাক।

ফুট্‌কার ঘন ঝোপ। থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। গাদা গাদা ফড়িং উড়ছে। লুকিয়ে পড়বার একটা জায়গা আছে। লুকিয়ে পড়ে চারটে কৈফিয়ৎ-ভীরু প্রাণ।

পি কে রায় আর প্রকাশদা এই ফুট্‌কা ঝোপেরই ওপাশ দিয়ে গল্প করে করে চলে গেলেন। কি আশ্চর্য, পি কে রায় যে সত্যিই একটা অদ্ভুত কথা বলছেন।—তুমি কি অক্সফোর্ডে ছিলে?

প্রকাশদা হাসেন—আজ্ঞে না, আমি কখনও বিদেশে যাইনি।

—এখানে কি কর?

—আমি মহিম সেমিনারির সেকেণ্ড টিচার।

—অ্যাঁ? যেন চমকে উঠলেন পি কে রায়।

চলে গেলেন পি কে রায় আর প্রকাশদা।

ফুট্‌কা ঝোপের আড়াল থেকে বের হয়ে চার বন্ধু যেন চার জোড়া মুগ্ধ কৌতূহলের চোখ তুলে দেখতে থাকে, বিদ্বান পি কে রায় প্রকাশদার কাঁধে হাত রেখে গল্প করতে করতে চলে যাচ্ছেন।

অভয় বলে—সত্যি বলছি বিমল, প্রকাশদার জন্যে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছে।

বিমল—কেন বল তো?

অভয়—প্রকাশদার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল ছিল। ত্রিশ টাকা মাইনেতে প্রকাশদার মত মানুষের এখানে একটা সেকেণ্ড স্যার হয়ে পড়ে থাকা একটুও ভাল দেখায় না।

নীহার—চলে গেলেই তো পারতেন প্রকাশদা।

শেখর—আমিও তো তাই বলছি। আমাদের স্কুল অবিশ্যি কানা হয়ে যাবে, তবু প্রকাশদার তো ভাল হবে।

বিমল—আমাদের স্কুলটার জন্যে প্রকাশদার খুব বেশি মায়া পড়ে গেছে।

অভয় রাগ করে বলে—আমি তো দেখছি, একটা টিউশনির জন্য প্রকাশদার খুব বেশি মায়া পড়ে গেছে।

শেখর—যাঃ, বাজে কথা।

নীহার হাসে—আমি একটা কথা বলতাম, কিন্তু বলবো না।

শেখর—বল্ না।

নীহার—আচ্ছা, শৈলেশদার সঙ্গে বাণীদির যদি বিয়ে না হতো, তবে কার সঙ্গে বিয়ে হলে বাণীদিকে মানাতো ?

বিমল—প্রকাশদার সঙ্গে।

অভয়—আমি বলবো, প্রকাশদার সঙ্গে বাণীদিকে বেশী মানাতো।

শেখর—কিন্তু বাণীদি যে নিজেই শৈলেশদাকে পছন্দ করে···।

অভয়—প্রকাশদাকেও তো পছন্দ করতে পারতেন বাণীদি।

বিমল—চুপ! আর এসব কথা নয়। এখন একটা কাজ করা যাক।

—কি ?

—'মেনস্ স্যানা ইন কর্পোরি স্যানো' করা যাক।

—তার মানে ?

—একসঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে পি কে রায় আর প্রকাশদার পাশ কাটিয়ে চলে যাই। দেখে খুশি হবেন পি কে রায়।

—ঠিক বলেছিস।

॥ ষোল ॥

প্রথম যেদিন পড়াতে এসেছিল প্রকাশ মাস্টার, সেদিন এই ঘরেই টেবিলের কাছে দুটি চেয়ারে বসে গল্প করছিল শৈলেশ আর বাণী।

প্রকাশ আসতেই খুশি হয়ে হেসেছিল শৈলেশ—আসুন।

আর, বাণী চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুখে কোন অভ্যর্থনার ভাষা না থাকলেও বাণীর চোখ দুটোই হেসে হেসে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। মাথার কাপড়টাও একটু বড় করে টেনে দিয়েছিল বাণী।

কিন্তু শৈলেশ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আর বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—তুমি বসো।

শৈলেশের সেই গম্ভীর শাসনের কথাটা যেন একটা সতর্ক প্রেস্টিজের গম্ভীর কথা। প্রকাশ মাস্টার বোধহয় শুনতে পায়নি ; কারণ বেশ একটু মৃদুস্বরে আর চাপা গলায় কথাটা বলেছিল শৈলেশ।

প্রকাশ মাস্টার শুনেছে বলেও মনে হয় না। প্রকাশ মাস্টার যেন তার মুখভরা হাসির আবেশেই বধির হয়ে রয়েছে। ঘরের ভিতরে ঢুকেই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা বইগুলির দিকে তাকায় প্রকাশ। তারপরেই বলে—আমি আজ শুধু বইগুলি একবার দেখবো। কাল থেকে পড়াবো আর বেশ শক্ত টাস্কও দিয়ে যাব।

শৈলেশ হাসে—মোট কথা, আপনার কাছ থেকে গ্যারেন্টি পেতে চাই, বাণী যেন এক চান্সেই বেশ ভাল করে পাশ করতে পারে।

প্রকাশ হাসে—তাহলে উনিও আমাকে গ্যারেন্টি দিন। টাস্ক যা দিয়ে যাব, সেটা ফেলে রাখবেন না। রোজ নিয়মমত খাটতে হবে।

বাণী হেসে ফেলে—ইচ্ছে করে ফাঁকি নিশ্চয়ই দেব না।

প্রকাশ—তাহলেই হলো।

বই দেখে প্রকাশ, আর মাঝে মাঝে শৈলেশের সঙ্গে কথাও বলে। বাণী হঠাৎ ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। তারপরেই ট্রে'র উপর সাজিয়ে চায়ের পেয়ালা আর খাবারের ডিস নিয়ে ঘরের ভিতরে দেখা দেয়।

শৈলেশের চোখে আবার যেন একটা ক্ষুব্ধ বিস্ময় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বাণী যেন একটা ভয়ানক শ্রদ্ধার নৈবেদ্য হাতে নিয়ে ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়েছে। বাণীর চেহারাটা যেন একটা নিদারুণ খুশির ব্যস্ততা।

চা আর খাবার খেয়ে চলে যায় প্রকাশ মাস্টার। আর শৈলেশের এতক্ষণের ক্ষুব্ধ বিস্ময়টা এইবার তার গলার স্বরেই জ্বলে ওঠে।—তুমি এসব আবার কি আরম্ভ করলে?

বাণী—কি হলো?

—চা আর খাবার তুমি নিয়ে এলে কেন?

—কি বললে?

—ও কাজটা রামদয়াল করবে। তুমি মিছিমিছি কেন···?

—আমাকে পড়াবেন যিনি, তাঁকে রামদয়াল কেন চা-খাবার এনে দেবে? এটা আবার কি-রকমের কথা বলছো তুমি?

—ঠিক বলছি! তুমি বোধহয় তোমার নিজেরই প্রেস্টিজের দিকটা ভেবে দেখতে ভুলে গিয়েছ।

—প্রেস্টিজ?

—হ্যাঁ। প্রকাশ মাস্টারকে পঞ্চাশ টাকা মাইনে দেব। এটাই যথেষ্ট। এর বেশি সম্মান করবার কোন দরকার হয় না।

—বুঝলাম না।

—কি বুঝলে না?

—আমি নিজে চা-খাবার এনে দিলে ভদ্রলোককে কী এমন বেশি সম্মান করা হয়?

—হয় বইকি।

—ছাত্রী তার টিউটরকে যদি একটু সম্মানই করে···।

—না। সম্মান করবার কোন প্রশ্নই এর মধ্যে আসে না।

—অসম্মান করাও তো উচিত নয়।

—আমি তো অসম্মান করতে বলছি না। রামদয়াল আমার মক্কেল সীতারাম আগরওয়ালাকেও চা এনে দেয়। তাতে কি সীতারামের অসম্মান হয়েছে?

—তুমি কার সঙ্গে কার তুলনা করছো?

—সীতারাম আগরওয়ালা লক্ষপতি মানুষ। প্রকাশ মাস্টার পঞ্চাশ টাকা মাইনের মানুষ। তুলনা চলে না ঠিকই।

শৈলেশের মুখের দিকে বোবা বিস্ময়ের দুটো চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে বাণী। ঠিকই, মুহুরী বামাচরণবাবুর মেয়ে, মানুষের প্রেস্টিজ-তত্ত্বের নিয়ম-কানুন জানে না, বুঝতেও পারে না। শৈলেশের ইচ্ছার কথাগুলিকে বুঝতে পারছে না বলেই ভাল লাগছে না। ঠিকই, মাটির চোখ দিয়ে আকাশের কোন দুঃখকে দেখতে পাওয়া যায় না। শৈলেশের মত মানুষের প্রেস্টিজের দুঃখটাকেও তাই চিনতে পারছে না বাণী।

বাণী বলে—আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

শৈলেশের চোখের দৃষ্টিটা হেসে ওঠে।—আমারও তাই মনে

হয়েছে। তুমি ঠিক বুঝতে পারনি বাণী। তাই আমার সঙ্গে এত তর্ক…।

বাণীও হেসে ফেলে—না, আর তর্ক করবো না। বরং…।

—কি?

—আমার কোন ভুল দেখতে পেলে তুমি তখুনি বলে দিও।

না, আর কোন ভুল দেখতে পায় না শৈলেশ। বরং দেখতে পায়, বাণী নিজেই ওর প্রেস্টিজ সম্বন্ধে খুব সজাগ আর খুব সতর্ক হয়েছে। পড়ার কথা ছাড়া প্রকাশ মাস্টারের সঙ্গে অন্য কোন কথা ভুলেও আলোচনা করে না বাণী। আর প্রকাশ মাস্টারও যেন তার অবাধ সৌজন্যের হাসিটাকে অনেক সংযত করে ফেলেছে। দেখে খুশি হয়েছে শৈলেশ, প্রকাশ মাস্টার সত্যিই একটা কঠোর টাস্ক-মাস্টার। সারারাত জেগে আর অনেক ভেবে ভেবে ম্যাক-বেথের বিবেক সম্বন্ধে দশপাতার যে প্রবন্ধ লিখেছে বাণী, সেটা পড়েই সেদিন ধমক দিয়ে উঠেছিল প্রকাশ মাস্টার—রাবিশ!

বাণী বলে—তাহলে বলে দিন…।

প্রকাশ—তাহ'লে মন দিয়ে শুনুন।

এক ঘণ্টা ধরে ম্যাকবেথের মন আর বিবেক ব্যাখ্যা করে চলে গেল প্রকাশ মাস্টার।

হ্যাঁ, দেখে খুশি হয়েছে শৈলেশ, প্রকাশ মাস্টার যখন আসে তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না বাণী। টেবিলের বইগুলির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে। দেখেছে শৈলেশ, রামদয়াল চা-খাবার এনে দিয়েছে। বেশ খুশি হয়ে খেয়েছে প্রকাশ মাস্টার।

॥ সতের ॥

ছোট শহরের মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা বড়রকমের হতে পারে না। মিউনিসিপ্যালিটি একটু বেশি গরীব বলেই পথের পাশে বেশি আলো জ্বেলে দিতে পারে না। একটা কেরোসিনের বাতির পোস্ট এখানে, আর একটা হয়তো তিন শো গজ দূরে। শুক্লপক্ষের দিনে পথের পাশের এই টিমটিমে বাতিও জ্বলে না। আর সেটাই যেন একটা সৌভাগ্য। চাঁদনি সন্ধ্যার কিংবা রাতের এই ধুলো-জঞ্জালের ছোট শহরও একটা মায়াপুরীর মত দেখায়।

যেখানে বাসস্ট্যাণ্ড, যেখানে দু'চারটে দোকানের আলো পথের উপর ছড়িয়ে পড়েছে, সেখানেও স্ট্যাণ্ডের গাড়ি আর মানুষের ভিড়কে একগাদা জ্যোৎস্নাময় শরীরের ভিড় বলে মনে হয়। সবই অস্পষ্ট, তবু মুখগুলিকে যেন স্পষ্ট চিনে ফেলতে পারা যায়।

বিমল বলে—ও কে রে শেখর ?

—কে ?

—ঐ যে বাস-অফিসের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট কিনছে ?

—তাই তো। নিশ্চয় প্রকাশদা।

ঠিকই দেতে পেয়েছে বিমল। অভয় আর একটু এগিয়ে যেয়ে দেখে আসে; হ্যাঁ, প্রকাশদাই টিকিট কিনছেন। কিনে ফেলেছেন।

প্রকাশদার সঙ্গে তো কেউ নেই। তবে কার জন্যে টিকিট কিনলেন প্রকাশদা ? প্রকাশদা নিজেই কোথাও যাবেন ? না, অন্য কেউ যাবে ?

নীহার বলে—প্রকাশদা সত্যিই যে গয়া যাবার বাসটার দিকে যাচ্ছেন।

অভয়—গয়াতে কি এখন পিতৃপক্ষ চলছে?

নীহার—এমাসে পিতৃপক্ষ হবে কেমন করে?

—তবে?

—কালকের দিনটাও তো ছুটির দিন নয়!

—তা ছাড়া, প্রকাশদা তো ছুটি নেননি।

—আজও তো কালকের পড়া বলে দিলেন প্রকাশদা।

—হেড স্যারও তো বললেন না যে, প্রকাশদা ছুটি নিয়েছেন।

—হ্যাঁ, না বলে কয়ে চলেই যাচ্ছেন প্রকাশদা।

—এর মানে কি?

ঠিকই, গয়ার বাসের ভিতরে উঠতে যাচ্ছিল প্রকাশ, তখনি পিছনের এক গাদা ব্যস্ত আহ্বানের শব্দ শুনে চমকে ওঠে; কোথায় যাচ্ছেন স্যার? কেন যাচ্ছেন স্যার? গয়াতে কেন স্যার?

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন ভাবতে থাকে প্রকাশ। তারপর হেসে হেসে বলেই ফেলে—আমি সত্যিই চলে যাচ্ছি।

—কেন স্যার?

—আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

—কিন্তু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ কেন চলে যাচ্ছেন?

প্রকাশ আবার হাসে।—কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম যে।

—আপনি চলে গেলে আমাদের কিন্তু খুব ক্ষতি হবে।

—কিচ্ছু ক্ষতি হবে না। কোন ক্ষতি হবে না। চমৎকার একজন নতুন সেকেণ্ড স্যার আসবেন।

অভয় বলে—কিন্তু বাণীদিকে কে পড়াবে স্যার?

বাস-স্ট্যাণ্ডের ভিড়ের ছুটোছুটির ব্যস্ততায় ধুলো উড়ছে; ধুলোতে জ্যোৎস্নাতে মাখামাখি হয়ে একটা অদ্ভুত ধাঁধা হয়ে উঠছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকে প্রকাশ মাস্টার।

বিমলের হাতে খুব জোরে একটা চিমটি কেটে অভয় এবার যেন একটা নির্ভয় উৎসাহের আবেগে চেঁচিয়ে কথা বলে—বাণীদির কিন্তু সত্যিই ক্ষতি হবে স্যার।

প্রকাশ মাস্টার পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে। তারপর সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে বেড়াতে থাকে। তারপর থমকে দাঁড়ায়। তারপর বেশ ব্যস্তস্বরে কথা বলে—তোমরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? বাড়ি যাও।

অভয়—আপনি স্যার?

প্রকাশ—আমিও বাড়ি যাচ্ছি। এখনই যাব।

একটু দূরে চলে গিয়েই মুখ ফিরিয়ে তাকায় বিমল আর নীহার, শেখর আর অভয়। আর, চার জোড়া চোখ থেকে যেন চার-জোড়া খুশির জ্যোৎস্না উপচে পড়ে। বাস অফিসের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে টিকিট ফেরত দিচ্ছেন প্রকাশদা।

বাড়ি ফিরে যাবার জন্য সড়কের মোড় ঘুরে সোজা হাঁটতে থাকে ছোট শহরের ছোটছোট বুদ্ধির চারটি দোসর; বিমল আর অভয়, নীহার আর শেখর। কিন্তু হেঁটে যাবার দুরন্ত ভঙ্গীটা যেন একটা জগজ্জয়ী দুরন্ত উল্লাসের ভঙ্গী।

রাস্তার পাশে একটা বাড়ি। দেখলে পড়ো বাড়ি বলেই মনে হয়। কারণ, এ-বাড়িতে আজকাল আর কেউ থাকে না। পাঁচিলের কাছে একটা টক-পেয়ারার গাছের মাথায় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে।

বিমল বলে—মনে পড়ে অভয়?

অভয়—কি ?

বিমল—এই গাছটাকে।

—পড়ে বইকি ; কিন্তু গাছটা বড় কাহিল হয়ে গেছে রে বিমল।

বিমল—আর ঐ জানালাটাকে মনে পড়ে ?

এটা হলো সেই মুহুরী বামাচরণবাবুর বাড়ি ; যে-বাড়িতে আজকাল আর কেউ থাকে না। ঐ জানালাটা হলো সেই জানালা, যেখানে একদিন বাণীদির সেই সুন্দর মুখটা হাসছিল ; আর শৈলেশদা এসে···। বিমল আর নীহার তখন ঐ টক-পেয়ারা গাছের উপরের ডালে চুপ করে বসেছিল।

মহিম-ভবনের ফটক পার হয়ে চলে যাবার সময় অভয় হঠাৎ ছটফট করে ওঠে। —চল্‌ বিমল, বাণীদির সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

মহিম-ভবনের বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের জানালার লেসের পর্দাগুলি কাঁপছে। আর টেবিলের উপর বই রেখে একমনে বই পড়ছে বিমল আর অভয়দের সেই বাণীদি। সেই সুন্দর মুখটা এখনও সেইরকমই সুন্দর দেখাচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠে দরজার দিকে তাকায় বাণী ; যেন নিজেরই মনের ভিতরে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে। হাততালি দিয়ে একসঙ্গে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢোকে বিমল আর অভয়, শেখর আর নীহার। —কেমন ? ভয় পেয়েছেন কিনা ?

বাণী—তোমরা হঠাৎ কোত্থেকে এলে ?

অভয়—হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, তাই হঠাৎ খবর দিতে চলে এলাম।

বাণী—কিসের অদ্ভুত ব্যাপার ?

বিমল—আর একটু হলে প্রকাশদা চলেই যেতেন।

বাণী—কোথায় ?

অভয়—কে জানে কোথায় ? বোধহয় গয়াতে।

বাণী—কেন ?

নীহার—এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না প্রকাশদার।

বাণী—ছুটি নিয়েছেন ?

শেখর—কিচ্ছু না, কাউকে না বলে কয়ে হঠাৎ চলে যাচ্ছিলেন।

বাণী—শেষ পর্যন্ত যাননি তাহলে ?

বিমল—না।

নীহার—ওঃ, কি-ভয়ানক সাধতে হয়েছে, তবে যাওয়া বন্ধ করলেন প্রকাশদা।

অভয়—কোন সাধাসাধিতে কিছু হয়নি। যেই বললাম, বাণীদিকে তবে পড়াবে কে, বাণীদির ক্ষতি হবে যে, অমনি চুপ করে গেলেন।

নীহার—কেনা টিকিট ফেরত দিলেন।

বাণী বলে—বেশ রাত হয়েছে অভয়, তোমরা এখন···।

—হ্যাঁ, যাচ্ছি বাণীদি। শুধু এই কথাটা জানবার জন্যেই···।

হুড়মুড় করে একসঙ্গে ঘর থেকে বের হয়ে চলে গেল, ক্লাস নাইনের চারটি মানুষ ; যেন চারটি কৃতার্থতার একটি দুরন্ত টীম।

॥ আঠার ॥

সেকেণ্ড স্যার প্রকাশ মাস্টারকে সত্যিই ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বিমল নীহার অভয় আর শেখর বেশ আশ্চর্যও হয়েছে। প্রকাশদা নিজেও যেন একটা ধাঁধা। যেন দুটো মানুষ। একটা মানুষ বাইরে-বাইরে থাকেন, আর-একটা মানুষ ঘরের ভিতরে চুপ করে পড়ে থাকেন।

স্কুলেতে প্রকাশদা খুব হাসি-খুশি মানুষ। কত ব্যস্ত মানুষ। কত জোরেজোরে চেঁচিয়ে কথা বলেন। বাণীদিকে যখন পড়াতে যান প্রকাশদা, তখনও দেখতে পায় শেখর আর নীহার, যেন বাণীদিকে পড়াবার জন্যে নয়, বাণীদির গলার সেই গানটা শোনবার জন্য প্রাণ-মন ব্যস্ত করে ছুটে চলেছেন।

কিন্তু বিমল আর অভয় দু'জনেই বাণীদির বাড়িতে গিয়ে অনেকবার উঁকি দিয়ে দেখে এসেছে, প্রকাশদা শুধু চেঁচিয়ে পড়িয়ে চলেছেন। বাণীদির মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়েও দেখছেন না।

বাণীদি পড়তে বসেন যে ঘরে, বাড়ির বাইরের দিকের সেই প্রকাণ্ড ঘরের ভিতরে একটা হারমোনিয়মও আছে। কিন্তু বিমল আর অভয় সে-ঘরের বাইরে জানালার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও বুঝতে পেরেছে, গানের কোন কথাই আলোচনা করছেন না প্রকাশদা। এই এক বছরের মধ্যে বাণীদির হারমোনিয়ম টুঁ শব্দও করেনি। সন্দেহ হয়, বাণীদি নিজেই কি রাগ করে গান ছেড়ে দিলেন ?

শৈলেশদাই বা কি-রকমের সখের মানুষ ? বাণীদির যে-গান শুনে শৈলেশদা···।

বিমল বলে—থাক সে কথা। বোঝা যাচ্ছে শৈলেশদার প্রাণেও আর গান নেই।

অভয় বলে—শৈলেশদার প্রাণে এখন অন্য একটা সখ চেপেছে।

—কিসের সখ ?

—রায়সাহেব হবার সখ।

—কোথায় শুনলি ?

—বাবা বলছিলেন।

সখ আছে সবারই, সখ নেই বোধহয় শুধু এই প্রকাশদার। এমন কি বাণীদিকে একদিন ভুলেও গান গাইতে বললেন না প্রকাশদা। অদ্ভুত !

যাই হোক, বাইরে একরকম আর ঘরের ভিতরে ওরকম কেন প্রকাশদা ? বিমল অভয় শেখর আর নীহার, কতবার হঠাৎ গিয়ে দেখেছে, ঘরের ভিতরে একেবারে নীরব নিথর হয়ে বসে আছেন প্রকাশদা। খাটের উপর কয়েকটা বই ছড়ানো আছে ; টাকা-পয়সা ছোট্ট একটা টেবিলেরই উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। দু' চারটে জামা-কাপড় আলনাতে ঝুলছে। ঘরটাও খুব ছোট। তারই মধ্যে যেন একটা সমাধির ছায়া-মানুষের মত চুপ করে বসে আছেন প্রকাশদা। মুখে হাসি নেই, চোখে ঝকঝকে চাহনিও নেই।

টাউনের ভিতরে একটা ছোট সড়কের এক কিনারায় ছোট্ট এই ঘর, যে ঘরে থাকেন প্রকাশদা। জায়গাটা মোটেই নিরিবিলি নয়। লোকের হাঁকডাক চেঁচামিচি চারদিকে হৈ-হৈ করছে। অথচ প্রকাশদা বলেন, তিনি একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন।

হ্যাঁ এটাও একটা নিরিবিলি বটে। ধুলো ধোঁয়া আর বাজারে

চিৎকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা নিদারুণ একটা নিরিবিলি। অথচ দেখতে পাওয়া যায়, এই প্রকাশদাই টাউনের বাইরের সেই খোলামেলা লালমাটির ডাঙ্গাটাকে কত ভালবাসেন। সেখানে যে মানুষ হন্তদন্ত হয়ে হেঁটে বেড়ায়, সে মানুষ এখানে এই ঘরের ভিতরে এত নিথর হয়ে বসে থাকতে পারে কেমন করে?

শুধুই কি চুপ ক'রে বসে থাকেন? শেখর একদিন দেখেছে, বালিশটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আর চোখ বন্ধ করে বিছানার উপর যেন একটা আহত মানুষের মত পড়ে আছেন প্রকাশদা, আর ...সত্যি বলছি নীহার, স্বচক্ষে দেখলাম, প্রকাশদার চোখের পাতা ভিজে গিয়েছে।

নীহার কিছুক্ষণ কি-যেন ভাবে, তারপর হঠাৎ বলে ওঠে।—বাণীদির পরীক্ষাটা কবে?

শেখর—কে জানে কবে?

এত সস্তা হয়ে এখানে পড়ে আছেন প্রকাশদা। তাতে লাভ হচ্ছে সবারই। স্কুলের লাভ, বাণীদির লাভ। কিন্তু প্রকাশদার লাভ কোথায়?

বিমল বলে—বাণীদি তো কোনদিন নিজের হাতে এক কাপ চা পর্যন্ত প্রকাশদাকে খাওয়ালেন না।

অভয় বলে—বাণীদি তো আগে এরকম ছিলেন না। মনে আছে তো বিমল?

বিমল—খুব মনে আছে।

নীহার—কি?

অভয়—বাণীদির তখনো বিয়ে হয়নি। আমরা কতবার দেখেছি, নিজের হাতে ঘটি থেকে জল ঢেলে ভিখারীগুলোকে জল খাওয়াচ্ছেন বাণীদি।

নীহার—তাহলে কি প্রকাশদাকে একটা ভিখারীর চেয়েও বাজে লোক মনে করেন বাণীদি? কখ্খনো না।

অভয়—তাই তো বলছি; প্রকাশদার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছেন কেন বাণীদি?

বিমল—সত্যি বাণীদিকে একটুও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

॥ উনিশ ॥

এই ছোট শহরের জীবনে দুটি খবর হলো দুটি বড় রকমের চাঞ্চল্যের খবর। বাণী, এই শহরেরই মেয়ে বাণী বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে, এটা যেমন শহরের মহিলা আর মেয়েদের আশা আর আগ্রহের কাছে বড় খবর ; তেমনই এই ছোট শহরের ভদ্রলোকদের কাছে একটা বড় খবর এই যে, শৈলেশের সত্যিই রায়সাহেব হবার সম্ভাবনা আছে।

পাটনাতে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এসেছে বাণী। শৈলেশও সঙ্গে গিয়েছিল। পাটনাতে সে দশটা দিন শৈলেশও চুপ করে বসে থাকে নি। চেষ্টা করে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছে, আর গভর্নরের বন্যা রিলিফ ফাণ্ডের জন্য পাঁচ হাজার টাকার একটা চেক গভর্নরের হাতে তুলে দিয়েছে। শোনা গেছে, রায়বাহাদুর কালিকাপ্রসাদ চেষ্টা করে গভর্নরের সঙ্গে মোলাকাতের এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

যাঁরা এই খবরটা জানেন, তাঁরা কিন্তু এখনও একটু সন্দিগ্ধ হয়ে আছেন। প্রশ্নটা হলো, এদিক থেকে জেলার ডেপুটি কমিশনার যদি শৈলেশের নামটাকে রায়সাহেব খেতাবের জন্য সুপারিশ না করে পাঠান, তবে কি কোন সুফল হবে? মনে তো হয় না।

ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব বড় কড়া মেজাজের মানুষ। এই তিন বছর ধরে তিনি এই জেলার একটি মানুষের নামও খেতাবের জন্যে সুপারিশ করেননি। এই শহরের কেউ আজ পর্যন্ত রায়সাহেব হতে পারেননি। সীতারাম আগরওয়ালা লিস্টার সাহেবের কাছে গিয়ে কতবার কত ছুতো করে ধর্না দিয়েছে ;

হাসপাতালের নতুন বাড়ি তৈরী করবার জন্য দশ হাজার টাকা দানের চেক লিস্টার সাহেবের হাতেই তুলে দিয়েছিল সীতারাম আগরওয়ালা। জয়পুরী কারিগর আনিয়ে লিস্টার সাহেবের একটা মার্বেল মূর্তি তৈরী করিয়ে উপহারও দিয়েছিল। কিন্তু কোন লাভ হয়নি।

এহেন ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব যেদিন মহিম সেমিনারির প্রাইজের অনুষ্ঠানে এলেন, সেদিন স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট পড়লো সেক্রেটারী শৈলেশ রায়। আর সেদিনই বুঝতে পারা গেল, শৈলেশের ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। যে লিস্টার সাহেব কোন রাজাগোছের জমিদারের মুখের দিকেও তাকাতে চান না, সে লিস্টার সাহেব যেন বিস্মিত হয়ে, আর বেশ মুগ্ধ হয়ে সেক্রেটারী শৈলেশের মুখের দিকে তাকিয়ে স্কুলের বার্ষিক রিপোর্ট শুনলেন। ফুলস্কেপ কাগজের দশ ,পাতার একটা রিপোর্ট। রিপোর্ট তো নয়, যেন এডুকেশন সম্বন্ধে একটা থীসিস। এডুকেশনের নানা অসুবিধা আর সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে একটা চমৎকার আলোচনা।

প্রাইজের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর লিস্টার সাহেব শৈলেশকে ডাকলেন। হেসে হেসে অনেক কথা বললেন। তারপর রিপোর্টটাকেও চেয়ে নিলেন।

হেডমাস্টার রাখালবাবু বেশ আশ্চর্য হয়েছিলেন। —আমি তো এই চার বছরের মধ্যে কোন বছরেই সেক্রেটারীকে এমন জ্ঞানের আর এমন জমকালো ভাষার রিপোর্ট পড়তে দেখিনি। সত্যি একটি রিপোর্ট হয়েছে বটে, লিস্টার সাহেবের কড়া মেজাজও গলিয়ে দিয়েছে।

বাণীরও চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা বিস্ময়ের খুশি স্মিত হয়ে ওঠে।—বিমলের মা একটা কথা বলে গেলেন ; কথাটা কি সত্যি ?

শৈলেশ—কি কথা বলে গেলেন বিমলের মা ?

—তোমার নাকি রায়সাহেব হবার কথা উঠেছে।

—এখনও ওঠেনি ; উঠবে বলে আশা হচ্ছে।

—কেন ?

—লিস্টার সাহেব যখন আমার উপর খুশি হয়েছেন, তখন মনে হচ্ছে, আশা করা ভুল হবে না। আসল ফাঁড়া তো এখানেই ছিল। ডেপুটি কমিশনার সুপারিশ না করলে কিছুই হবার নয়। যাক্, সে ফাঁড়া কেটে গিয়েছে।

—কি করে কাটালে ?

—এডুকেশন সম্বন্ধে একটা চমৎকার তাক-লাগানো রিপোর্ট পড়ে লিস্টার সাহেবকে শুনিয়েছি। স্কুলের প্রাইজে লিস্টার সাহেব এসেছিলেন।

—কবে রিপোর্ট লিখলে ?

শৈলেশ হেসে ফেলে—আমি লিখিনি। একজনকে দিয়ে লিখিয়েছি।

—কি বললে ?

—প্রকাশ মাস্টারকে দিয়ে রিপোর্টটা লিখিয়ে নিয়েছি। যাক্, এতদিনে লোকটাকে দিয়ে একটা ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারা গেছে।

বাণী বলে—তুমি কি এখনই আবার বের হচ্ছো ?

শৈলেশ—হ্যাঁ।

বাণী—কোথায় ?

—স্কুলেই যাচ্ছি। প্রকাশ মাস্টারকে দিয়ে আরও একটা কাজ করাবার আছে। এটাও খুব দরকারের কাজ।

—কিসের কাজ ?

—ঐ, আর-একটা রিপোর্ট লেখাতে হবে। এই জেলার একটা ইকনমিক রিপোর্ট। চেয়েছেন সেন্সাসের বড় সাহেব মিষ্টার লেসি, আই সি এস, যিনি গভর্নরের সেক্রেটারী ছিলেন।

বাণী যেন হাঁসফাঁস করে আস্তে আস্তে একটা বিস্ময়ের আতঙ্ক সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে—এই সাহেবকে আবার কোথায় পেলে ?

—এই তো একমাস হলো এখানেই সার্কিট হাউসে আছেন মিস্টার লেসি। আরও ভাল খবর হলো, মিস্টার লেসি আমাকে বলেই দিয়েছেন যে, তিনি নিজে চিঠি লিখে গভর্নরকে আমার নামটা জানিয়ে দেবেন। এখন আর আমার কোন সন্দেহ নেই বাণী, এই বড়দিনেরই খেতাবের লিস্টে দেখতে পাবে…।

শৈলেশের কৃতার্থ উৎফুল্ল মূর্তিটা যেন একটা অদ্ভুত হাস্যময় ব্যস্ততার মূর্তি হয়ে চলে যায়।

যাই হোক্, আজ আর এই ঘরে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। প্রকাশ মাস্টার আর পড়াতে আসবে না। তবুও চুপ করে বসে থাকে বাণী। টেবিলের উপর বইগুলিও যেন শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে চুপ করে পড়ে থাকে।

—কেমন আছেন বাণীদি? ছোট্ট একটা উল্লাসের প্রশ্নের শব্দ।

শুনে চমকে ওঠে, তার পরেই হেসে ফেলে বাণী—এতদিনে বাণীদিকে মনে পড়লো ?

বিমল বলে—এতদিন আপনার কাছে ঘেঁষবারও কি কোন উপায় ছিল ?

বাণী—কেন ? একথার মানে কি ?

নীহার—যা সাংঘাতিক পড়া শুরু করেছিলেন, যেন মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।

বাণী—বাঃ, এই দু'বছরে নীহারের কথার বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

অভয়—আমরা যে এখন ক্লাস টেন, ভুলে যাচ্ছেন কেন বাণীদি ?

বাণী—ওরে বাবা। সত্যিই, সব দিকেই উন্নতি।

শেখর—আপনারাই বা কোন্ দিকে উন্নতির বাকি রাখলেন বাণীদি ?

বাণী—তার মানে ?

বিমল—একজন হতে চলেছেন এ শহরের ফার্স্ট মেয়ে গ্র্যাজুয়েট, আর একজন এ-শহরের ফার্স্ট রায়সাহেব।

বাণী ভ্রূকুটি করে হাসতে থাকে।—বুঝলাম, আজ দলবেঁধে আমাকে ঠাট্টা করতে আসা হয়েছে।

বিমল—না বাণীদি। বিশ্বাস করুন, আমরা ঠাট্টা করতে আসিনি, আমরা নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

বাণী—কিসের নেমন্তন্ন ?

অভয়—ধীরেনদাদের ড্রামাটিক ক্লাব বিল্বমঙ্গল অভিনয় করবে। এই নিন কার্ড। অবশ্যই যাবেন কিন্তু।

নীহার—ধীরেনদা বার বার বলে দিয়েছেন, আপনার যাওয়া চাইই।

শেখর—শৈলেশদাকে আগেই কার্ড দিয়েছি।

॥ কুড়ি ॥

ছোট শহরের ছোট ড্রামাটিক ক্লাবের স্টেজও বেশ ছোট, কিন্তু তাই বলে থিয়েটারের আনন্দটা ছোট নয়। মস্ত বড় বাড়িতে আর অনেক লোকজনের মধ্যে একটি মাত্র ছোট ছেলে থাকলে তার কলরবের যেমন আদর হয়, এ-শহরে এই ছোট স্টেজের থিয়েটারেরও তেমনি আদর। বছরে মাত্র দু'দিন থিয়েটার করে ড্রামাটিক ক্লাব; কিন্তু সেই দুটো দিন এই ছোট শহরের জীবনে যেন দুটো উৎসবের দিন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সকাল থেকেই ব্যস্ত হয়ে থাকে; মহিলারা দুপুর থেকে, আর ভদ্রলোকেরা বিকেল থেকে। যে-সব বাড়িতে রান্নার ঠাকুর নেই, সে-সব বাড়িতে রাত্রির রান্না দিনের বেলাতেই সেরে রাখা হয়।

ড্রামাটিক ক্লাবের থিয়েটারের আয়োজন আর উৎসাহে শৈলেশ বরাবরই একটু বেশি সাহায্য করে থাকে। বেশি টাকা দেয় শৈলেশ, আর একটু বেশি খোঁজখবরও নেয়। ধীরেন স্বীকার করে, শৈলেশদার মত পেট্রন এখনও আছেন বলেই ড্রামাটিক ক্লাব এখনও হেসেখেলে চলছে।

পেট্রন শৈলেশ এবছরের এই বসন্তোৎসবের থিয়েটারকে একটা নতুন গৌরবের ব্যাপার করে তুলেছে। ডেপুটি কমিশনার লিস্টার সাহেব আর সেন্সাসের সুপার মিস্টার লেসিকে থিয়েটার দেখতে শৈলেশ নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এসেছে। দুই সাহেব খুশি হয়ে কথা দিয়েছেন, থিয়েটার দেখতে আসবেন।

অন্য বছর সন্ধ্যা হবার পর ভিড় হয়, এ-বছরের এই বসন্তোৎ-

সবের বিল্বমঙ্গলে সন্ধ্যার অনেক আগেই ভিড় জমে গিয়েছে। সামিয়ানার ভিতরে আর লোক ধরবে না বলে মনে হয়। সবচেয়ে বেশি ভিড় করেছেন বয়স্ক ভদ্রলোকেরাই।

সাতটায় আরম্ভ হবে বিল্বমঙ্গল। সাতটা বাজবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে উপস্থিত হলেন তুই সাহেব, লিস্টার আর লেসি। শৈলেশই এগিয়ে গিয়ে অভিবাদন করে তুই সাহেবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। সামনের সারির ঠিক মাঝখানে, সিংহাসনের মত দেখতে তুটো প্রকাণ্ড চেয়ারে তুই সাহেব বসলেন। এই স্পেশাল চেয়ার তুটোকে শৈলেশই কুমারসাহেবের বাড়ি থেকে আনিয়ে রেখেছিল।

বিমল অভয় নীহার আর শেখর—ওরা হলো ভলান্টিয়ার। শৈলেশ যেমন সাহেব তু'জনকে আপ্যায়িত করবার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে; ওরা তেমনই ওদের বাণীদিকে আপ্যায়িত করবার কাজে ব্যস্ত। মেয়েদের জায়গাটা যে চিক দিয়ে আড়াল করা, সেই চিকের বাইরে একটা চেয়ারের উপর বসেছে বাণী। পেট্রন শৈলেশও আজ যেন হেড ভলান্টিয়ারের মত ঘুরে ফিরে দেখা-শোনা করছে, আর মাঝে মাঝে সাহেবদেরই কাছের একটা চেয়ারে বসছে।

ধীরেন হঠাৎ এসে শৈলেশের কানের কাছে যেন একটা চাপা আর্তনাদের স্বরে কথা বলে। শৈলেশের চোখে-মুখেও যেন একটা আতঙ্ক চমকে ওঠে।

কি-যেন ভাবে আর ভাবতে গিয়ে ছটফট করে শৈলেশ। তারপরেই উঠে এসে বিমলকে ডাক দেয়—এখনই যাও, এই মুহূর্তে প্রকাশ মাস্টারকে ডেকে নিয়ে এস। আমার নাম করে বলবে, আমি ডাকছি।

চলে যায় বিমল। শৈলেশ আর ধীরেনও ব্যস্তভাবে বাইরে চলে যায়।

সাতটা বাজতে আর আধ মিনিট বাকি। শৈলেশ আবার ব্যস্তভাবে ফিরে এসে সাহেবদের পাশের চেয়ারে বসে। বিমল ছুটে এসে বাণীর কাছে এসে হাঁপাতে থাকে। যেন খুশি হয়ে হাঁপাচ্ছে বিমলের চোখ দুটো। নীহার শেখর আর অভয় বলে—কি ব্যাপার? বাণী বলে—কি হয়েছে বিমল?

বিমল বলে—বিল্বমঙ্গল হবেন যিনি, সেই পরেশদা হঠাৎ পড়ে গিয়ে জখম হয়ে হাসপাতালে গিয়েছেন। কাজেই, প্রকাশদা বিল্বমঙ্গল হবেন।

—সে কি! চেঁচিয়ে ওঠে নীহার আর শেখর।

অভয় বলে—পার্ট মুখস্থ নেই, তবে কেমন ক'রে···।

বিমল—হ্যাঁ, তবু রাজি হয়েছেন প্রকাশদা।

সাতটা বাজতেই ড্রপ সীন উঠলো। অভিনয় শুরু হলো। এক বর্ণও বাংলা বোঝেন না, তবু দুই সাহেবও যেন মুগ্ধ হয়ে দেখছেন আর শুনছেন। অভয়ের কানের কাছে ফিসফিস করে বিমল—প্রকাশদা যে সত্যিই মাত্ করে দিচ্ছেন।

প্রথম ড্রপ পড়ে যাবার পর দুই সাহেব চলে গেলেন। কিন্তু, বয়স্ক ভদ্রলোকদের ভিড়টা সেজন্য একটুও হালকা হয়ে গেল না, অথচ এই ভিড়টা হলো, ঐ দুই সাহেবের থিয়েটার-দেখা দেখবার ভিড়।

অভয় বলে—দেখছিস বিমল, মেজকাকাও কেমন চুপটি করে আর হাঁ করে বসে আছেন।

শেখর—প্রকাশদার বিল্বমঙ্গল দেখে একেবারে জমে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

নীহার বলে—কারও সাধ্যি নেই যে উঠে যায়।

আবার শুরু হয়েছে অভিনয়। বিল্বমঙ্গলের চোখে জল। বিল্বমঙ্গলের গলার স্বর কি-ভয়ানক ব্যাকুল হয়ে ছটফট করছে—আমি অতি দীন, আমি অতি হীন। হে রাখাল, জান যদি বল, হৃদয়ের আলো, কোথা বনমালী কালো? দাও এনে দাও, প্রেম-ক্ষুধা তৃপ্ত কর মোর।

হাততালি দিল অভয় আর বিমল; শেখর আর নীহারও হাত-তালি দিয়ে ফেলতো কিন্তু ওদের হাততালি আর হাততালির উৎসাহ সেই মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভ্রূকুটি করে ছুটে এসে ধমক দেয় শৈলেশ—স্টপ! স্টুপিড!

অভয় বলে—কি দোষ হলো শৈলেশদা?

—চুপ! রুষ্ট স্বরে আবার ধমক দেয় শৈলেশ।

মাথা হেঁট করে আর চুপ করে বসে থাকে অভয়। বিমল নীহার আর শেখরের মুখও যেন হঠাৎ চড়-খাওয়া মুখের মত লালচে হয়ে ওঠে।

চলে যেতে গিয়েই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায় শৈলেশ। চমকে উঠেছে শৈলেশের চোখ দুটোও। ওভাবে অমন করে স্টেজের দিকে তাকিয়ে আছে কেন বাণী? কি দেখছে বাণী? বাণীর চোখে পাতা পড়ে না কেন? কি শুনছে বাণী? বাণীর চোখ ছলছল করে কেন?

শৈলেশের চোখের ভ্রূকুটি একবার ছটফট করে শিউরে ওঠে। চলে যায় শৈলেশ। নিজের চেয়ারে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

থিয়েটার ভাঙ্গবার পর বাণীকে সঙ্গে নিয়ে আর গম্ভীর হয়ে যখন চলে যেতে থাকে শৈলেশ, তখন বিমল শেখর আর নীহার অভয়কে সামলাতে গিয়ে হয়রান হতে থাকে। আপত্তি আর

অনুরোধ কিছুই শুনতে চাইছে না অভয়। অভয় যেন একটা বিদ্রোহ। —না না, আমি বলবোই।

শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললো অভয়। —হাততালি একদিন শুনতেই হবে। এর চেয়ে আরও ভাল হাততালি।

মুখ ফিরিয়ে পিছনের দিকে একবার তাকায় শৈলেশ। চোখের ভ্রূকুটি আর একবার শিউরে ওঠে।

॥ একুশ ॥

মহিম-ভবন, তার মানে স্কুল সেক্রেটারী শৈলেশের বাড়ি আজ একটা উৎসবের বাড়ি। শৈলেশের বিয়ের দিনে যে-রকমের চাঞ্চল্য আর হর্ষ নিয়ে এই মহিম-ভবন মুখর হয়ে উঠেছিল, আজ আবার প্রায় সেই রকমেরই মুখর হয়ে উঠেছে। কত লোক আসছে হাসছে আর চলে যাচ্ছে। মহিলারা আসছেন, প্রবীনা নবীনা সকলেই। চায়ের পেয়ালার শব্দ সকাল থেকেই ঝনঝন করছে। ঝুড়ি ঝুড়ি মিষ্টি আসছে আর ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মহিম-ভবনের দুটি মানুষের জীবনের ঘটনা বটে, কিন্তু এই ছোট শহরের জীবনেরও দুটো গৌরবের ঘটনা। বি-এ পাশ করেছে বাণী। খবরটা এসেছিল কাল দুপুর বেলাতেই। আর পাটনা থেকে কালিকাপ্রসাদবাবুর টেলিগ্রামটা এসেছিল কাল রাত্রি দশটায়। রায়সাহেব খেতাব পেয়েছে শৈলেশ।

মহিম-ভবনের বাইরের ঘর, যে-ঘরটা দু' বছর ধরে বাণীর পড়ার ঘর ছিল, সে-ঘরের টেবিলে আর শেল্‌ফে আজও বইগুলি সাজানো আছে। ঘরটাকে অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে।

—কই গো, আমাদের শহরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট মেয়ে কি করছেন? দুপুর হতেই বিমলের মা এসে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে বাণীর গলা জড়িয়ে ধরেছেন।

বিকেল হবার পর বিমল শেখর নীহার আর অভয় আসে। অভয় বলে—আমরা কিন্তু রায়সাহেবকে সেলাম দিতে আসিনি বাণীদি।

বাণীদি হাসেন—তোমার রাগ এখনও পড়েনি দেখছি, অভয়।

—ও রাগ পড়বার নয়, বাণীদি ; আপনি কিছু মনে করবেন না।

বিমল বলে—না অভয়, আজকের দিনে কোন রাগারাগির কথা নয়। ওসব কথা ভুলে যা।

শেখর বলে—হ্যাঁ, আজ যে আমাদের একটা গর্বের দিন।

বাণী হাসে—কিসের এত গর্ব, শেখর ?

শেখর—গর্ব হলেন আপনি। আপনি এই শহরের গর্ব।

নীহার—আপনি আমাদেরও গর্ব।

বিমল—আপনি শৈলেশদারও গর্ব।

অভয়—আপনি প্রকাশদারও গর্ব।

ঘরের একটা জানলার কাচের পাট বন্ধ ছিল। ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে জানলার কাচের পাট দুটো খুলে দেয় বাণী। শেষ বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর রাখা ফুলদানির ফুলের পাপড়ি শিউরে উঠতে থাকে।

বিমল বলে—প্রকাশদা এসেছিলেন নাকি, বাণীদি ?

—না। তোমরা খাবার না খেয়ে চলে যেও না। একটু বসো।

খাবার আনতে চলে যায় বাণী।

—বাণী ; একটা মজার খবর আছে শুনে যাও। ও-ঘরের ভিতর থেকে ডাকছে শৈলেশ। সত্যিই একটা হাস্যোচ্ছল কৌতুকের ডাক, একটা ব্যাকুল খুশির ডাক।

বাইরে বের হবার জন্য তৈরী হয়েছে শৈলেশ। সাজ সারা হয়ে গিয়েছে। শৈলেশ হাসে—একটু কাছে এসে দাঁড়াও গ্র্যাজুয়েট মেয়ে। কথাটা চেঁচিয়ে বলবার কথা নয়।

বাণী—কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

—যাচ্ছি সার্কিট হাউসে। আজ সন্ধ্যায় লিস্টার সাহেবকে

একটা চা-পার্টি দেবার ব্যবস্থা করেছি। যাক্, কথাটা হলো, যে-কথাটা কোনদিন তোমাকে বলিনি। ইচ্ছে করেই চেপে রেখে-ছিলাম। কারণ, আমার দরকার ছিল কাজ হাসিল করা। তাই বাধ্য হয়ে চুপ করে ছিলাম, আর ঐ জোচ্চোর প্রকাশকে সহ্যও করেছিলাম।

চমকে ওঠে বাণী। চোখের তারা দুটোও দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

শৈলেশ—তুমি বোধহয় আগে বুঝতেই পারতে না, কেন আমি প্রকাশ মাস্টারের সম্পর্কে শক্ত কথা বলতাম। তুমি জানতে না বলেই বুঝতে পারতে না।

বাণী—আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

শৈলেশ বলে—আজ এখন আমি খুব ব্যস্ত ; এখন আর হবে না। সন্ধ্যে হলেই পার্টি থেকে ফিরে এসে প্রকাশকে পুলিশের হাতে তুলে দেব।

—কি ভয়ানক কথা বলছো ?

—একটুও ভয়ানক কথা নয়।

—কেন ?

—প্রকাশ বসু নামে ঐ মাস্টারটা প্রকাশও নয়, বসুও নয়, বি-এ'ও নয়।

—তার মানে ?

—তার মানে একটা ঠগ। পৃথিবীতে প্রকাশ বসু নামে বি-এ পাশ এক ভদ্রলোক ঠিকই আছেন। তিনি রেঙ্গুণে মাস্টারী করেন।

—ইনি তবে কে ?

—ইনি একটি ধাপ্পা ; একটি ভ্যাগাবণ্ড।

—কবে এসব খবর জানলে তুমি ?

—জেনেছি দু'বছর আগেই।

—তবে তখনই ওকে পুলিসে দিলে না কেন?

—সেটা এখনও বুঝতে পারছো না কেন?

—কেন?

—আমাদের সুবিধের জন্য ওকে এখানে আরও দুটো বছর রাখবার দরকার ছিল। এখন তো আর কোন দরকার নেই। আমি রায়সাহেবী পেয়ে গিয়েছি, তুমিও বি-এ পাস করেছো।

—তোমার পায়ে পড়ি। চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলে বাণী।

—খুব ভুল করছো বাণী! একটা ঠগের জন্যে এসব সেন্টিমেণ্টের কোন মানে হয় না।

—হলোই বা ঠগ, কিন্তু লোকটা তোমার আমার কত উপকার করেছে, ভেবে দেখ।

—সব ভেবে দেখেছি। আরও একটা কথা ভেবে দেখেছি, যেটা কোনদিন তোমাকে বলবো না।

কি-সাংঘাতিক একটা প্রতিজ্ঞার আগুন শৈলেশের চোখ দুটোতে জ্বলতে শুরু করেছে। বোধ হয় বাণীর এই কান্নাভেজা মুখটাকে একটা অভিশাপের মুখ বলে সন্দেহ করছে শৈলেশ। বোধহয় একটা ভয় পেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে শৈলেশের সেই ভালবাসার চোখ, যে-চোখে একদিন এই বাণীর মুখটাকে স্বপ্নলোকের এক মেয়ের মুখ বলে মনে হয়েছিল।

বাণী বলে—তুমি এমন কি কথা ভেবেছ, যা আমাকে কোনদিন বলতে পারবে না? এমন কি কথাই বা থাকতে পারে?

—জিজ্ঞাসা করো না।

—ছিঃ, এমন ভুল করো না। বিশ্বাস কর, তোমার ভাববার কিছুই নেই!

—আশ্চর্য!

—আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দোহাই তোমার, লক্ষ্মীটি, তুমি প্রকাশ মাস্টারকে পুলিসের হাতে দিও না। ওকে চুপে চুপে তাড়িয়ে দাও।

—কি বললে?

—চুপে চুপে চোরের মত এসেছিল, চুপে চুপে চোরের মতই চলে যাক্, লোকটা। ওকে পুলিসে দিয়ে আমাদের কি লাভ?

—লাভ আছে।

—কিছ্ছু লাভ নেই। বাণীর গলার স্বর যেন ধুলোয় লুটিয়ে পড়া একটা আহত প্রাণীর গলার স্বর।

—লাভ আছে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। শৈলেশের গলার স্বরও যেন একটা পাথরের প্রতিজ্ঞার স্বর।

—না। কোন লাভ নেই। বরং···।

—কি?

—ক্ষতি হবে?

—কার ক্ষতি?

—তোমার ক্ষতি, আমার ক্ষতি।

—বাজে কথা।···আমি চলি।

শৈলেশের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বাণী—ভুল করো না।

চোখ দুটো উদাস করে, যেন একটা মৃত্যুভয় থেকে বাঁচবার জন্য আবেদন করছে বাণী। কি-ভয়ানক করুণ হয়ে কাঁপছে বাণীর কথাগুলি: ভুল করো না।

শৈলেশ বলে—তুমি এক কাপ চা খেয়ে আর সুস্থ হয়ে একটু ভাব, কোথায় বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করছে; পুরীতে না সিমলাতে?

বাণীর হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে যায় শৈলেশ।

দেখে আশ্চর্য হয় বিমল আর অভয়, শেখর আর নীহার। মিষ্টি খাবার আনতে গিয়ে নিজেই যেন একেবারে তেতো হয়ে ফিরে এলেন বাণীদি। হাতে খাবারের ডিস নেই, শূন্য হাতে যেন একটা শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরে আর বেশ উতলা হয়ে ভিতরের ঘরের দিক থেকে ছুটে এলেন। এই তো এই মাত্র, বাইরে বেরিয়ে গেলেন শৈলেশদা। কিন্তু এরই মধ্যে ভিতরের ঘরের জীবনে এমন কি কাণ্ড হয়ে গেল, যে-জন্য এরকম একটা অদ্ভুত আর আলুথালু মূর্তি নিয়ে বের হয়ে এলেন বাণীদি ?

পড়ার ঘরের খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে আর শেষ বিকেলের রাঙা আলো ছড়ানো সামনের মাঠটার দিকে তাকিয়ে ছটফট করে বাণী।—বিমল !

—বলুন।

—তোমাদের প্রকাশদা কোথায় কতদূরে থাকেন ?

চেঁচিয়ে ওঠে অভয়—এই তো, এখান থেকে বড় জোর বিশ মিনিট ; টেম্পল্ রোড পার হয়েই···।

—এখন তোমাদের প্রকাশদা নিশ্চয় বাড়িতেই আছেন ?

—থাকতে পারেন। না থাকলেই বা কি ? খুজে বের করে নিতে পারবোই।

অভয় বলে—মনে হচ্ছে, প্রকাশদা এখন অন্ধ নন্দীসাহেবের বাড়িতে বই আনতে গিয়েছেন।

—কি বললে ? চেঁচিয়ে ওঠে বাণী। বাণীর গলার স্বর হঠাৎ যেন আর্তনাদ হয়ে বেজে উঠেছে। বুকের ভিতরে একটা গোপন বিস্ময়, এতদিনে নিজেকে চিনতে পেরেছে, মায়াহরিণের ডাক রক্ত-মাখা বেদনায় ছটফট করে উঠেছে।—নন্দীসাহেবের সঙ্গে তোমাদের প্রকাশদার কিসের সম্পর্ক ? কবে থেকে ? কেন ? কিসের জন্য ?

অভয় বলে - অনেকদিন থেকে। প্রকাশদা যে নন্দীসাহেবেরই লাইব্রেরী থেকে গাদা গাদা বই আনেন আর পড়েন। নন্দীসাহেব প্রকাশদাকে খুব ভালবাসেন।

—অভয়। বাণীর গলার স্বর যেন একটা উতলা ঝড়ের আবেদন।

অভয়ও ব্যস্তভাবে উত্তর দেয়--বলুন বাণীদি।

—আমাকে এখনি একবার নিয়ে যেতে পারবে?

—কোথায়?

—তোমাদের প্রকাশদার বাড়িতে।

—নিশ্চয়।

জানালার গরাদটা আঁকড়ে ধরে বাণী।—না থাক্,···তবে একটা কাজ কর।

—বলুন।

—প্রকাশদাকে এখনি একবার ডেকে নিয়ে আসতে পারবে?

—খুব পারবো।

জানালার গরাদ ছেড়ে দিয়ে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আর জোরে একটা হাঁপ ছেড়েই চেঁচিয়ে ওঠে বাণী—না থাক্।···তবে একটা কাজ কর।

—বলুন।

—তোমরাই যাও। গিয়ে বল যে, এখুনি যেন এই শহর ছেড়ে চলে যান প্রকাশদা। এক মিনিটও যেন দেরি না করেন। বলবে, আমি বলেছি।

—কেন বাণীদি?

বাণী—না চলে গেলে ধরা পড়ে যাবেন তোমাদের প্রকাশদা। বিপদ হবে। পুলিস আসবে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে বাণী।

বিমল বলে—আমরা এখনি যাচ্ছি।

—হ্যাঁ, যাও লক্ষ্মী ভাই। কিন্তু শুধু প্রকাশদাকেই বলবে; আর কাউকে এসব কথা বলবে না।

—কখ্খনো না।

ছুটে চলে যায় বিমল আর নীহার শেখর আর অভয়। টেম্পল রোড পার হয়ে যেতে দশ মিনিটও লাগে না।

ঘরের ভিতরেই বসে ছিল প্রকাশ মাস্টার।

বিমল আর অভয়ের উদ্বেগের বার্তা শুনে চমকে ওঠে, তারপরেই হাসতে থাকে।—এখুনি যাচ্ছি।

বিমল—কিন্তু আপনি চলে যাবেন কেন স্যার?

প্রকাশ—কেন? তোমাদের বাণীদি কিছু বলেন নি?

নীহার—না।

প্রকাশ হাসে—আমি বি-এ পাস-টাস নই। মিথ্যে কথা বলে তোমাদের স্কুলের সেকেণ্ড স্যার হয়েছিলাম।

আলনা থেকে শুধু কামিজটাকে তুলে নিয়ে গায়ে দেয় প্রকাশ। ঘরের আর কোন জিনিসের দিকে তাকায় না। ঘরের ভিতরে আর কোন জিনিস আছে বলে যেন মনেই করতে পারছে না; চোখেই দেখতে পাচ্ছে না।

ঘরের বাইরে এসে দরজার কপাটটাকে শুধু ভেজিয়ে দেয় প্রকাশ।

অভয় বলে—সত্যিই চলে যাচ্ছেন স্যার?

প্রকাশ—নিশ্চয়।

বিমল—তাহলে প্রণাম করি স্যার?

চোখ বড় করে হেসে ফেলে প্রকাশ—আমাকে প্রণাম করবে?

কর তাহ'লে।

চার ছাত্র প্রণাম করে। ভুয়া বি-এ, নাম-ভাঁড়ানো এক কপট সেকেণ্ড স্যার একটুও বিহ্বল বা বিচলিত না হয়ে, বরং হেসে হেসে যেন বুকভরা একটা তৃপ্তির ভারে নম্র হয়ে আর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যেতে থাকে।

অভয় বলে—বাণীদিকে কিছু বলতে হবে স্যার?

প্রকাশ—না।

কোথায় কোন্ দিকে চলে গেলেন সেকেণ্ড স্যার প্রকাশদা, কে জানে? রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে এসে, স্কুলের মাঠের কাছে পৌঁছতেই মনে হয়, প্রকাশদা যেন আবছায়াময় সন্ধ্যাটার বাতাসে চিরকালের মত মিশে গিয়েছেন।

মাঠের ঘাসের উপর ক্লান্তভাবে লুটিয়ে বসে পড়েই অভয় বলে—প্রকাশদাকে এতদিনে চিনতে পারা গেল। বাণীদির জন্যই···।

বিমল—তার মানে?

অভয়—বাণীদি চলে যেতে বললেন বলেই চলে গেলেন প্রকাশদা।

নীহার—কিন্তু বাণীদিকে তো জানিয়ে দেওয়া উচিত।

শেখর—কি?

নীহার—প্রকাশদা সত্যিই চলে গিয়েছেন।

অভয়—ঠিক কথা।

॥ বাইশ ॥

মহিম-ভবনের ফটকে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠে পিছন দিকে তাকায় আর এক পাশে সরে দাঁড়ায় বিমল আর অভয়, নীহার আর শেখব। সড়ক ধরে কি ভয়ানক স্পীড নিয়ে আর কি সাংঘাতিক হর্ন বাজিয়ে চিংকার করে ছুটে আসছে শৈলেশদার গাড়িটা। যেন রেগে ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে শৈলেশদার গাড়ির হেডলাইট দুটো। ফটকের কাছে এসে গাড়িটা যেন পাগল মাতালের মত একটা প্রচণ্ড ভিরমি খেয়ে টার্ন নিল; চার চাকার ঘষা খেয়ে কাঁকর ছিটকে পড়লো চারদিকে।

গাড়ি থেকে নামছেন শৈলেশদা, মহিম-ভবনের ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে ওরা দেখতে পায়। শুনতে পাওয়া যায়, শৈলেশদার জুতোর শব্দ যেন বাইরের বারান্দার মেজেটাকে ঠুকে-ঠুকে অন্যদিকের ঘরের ভিতরে চলে গেল।

বাণীদির পড়বার ঘরে যে আলো জ্বলছে, তা'ও দেখা যায়। আর, একটু এগিয়ে যেয়েই ওরা দেখতে পায়; হ্যাঁ, বাণীদি চুপ করে ঐ ঘরেই একটা চেয়ারে বসে আছেন। বাণীদির সুন্দর মুখটা এই একবেলার মধ্যেই যেন দুপুরের রোদে পোড়া ফুলের মত শুকিয়ে ঝিরঝির করছে।

কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে শৈলেশদার সেই আক্রোশের পদাঘাত আবার শব্দ ক'রে ক'রে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বাণীদির ঘরের দিকে চললো। বারান্দার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে শৈলেশদার চেহারাটা যেন একটা কালো পাথরের চেহারার মত

শক্ত হয়ে সেই ঘরের ভিতরে ঢুকলো, যে-ঘরের ভিতরে একটি চেয়ারে বাণীদি চুপ করে বসে আছেন, আর টেবিলের উপরে একগাদা বই স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।

অভয় ফিসফিস করে ডাকে—আয় বিমল। নীহার শেখর শিগ্‌গির আয়।

একেবারে নিথর হয়ে, বারান্দার অন্ধকারের সঙ্গে গা মিশিয়ে দিয়ে, এক ভুয়া সেকেণ্ড স্যারের চারটি দুরন্ত ছাত্র যেন ওদের এক দুঃসহ কৌতূহলের সমাপ্তি দেখবার লোভে চার-জোড়া চোখ সুস্থির করে আর উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকে।

বাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে শৈলেশ বলে—আমি থানা থেকে আসছি। পুলিস বললে, লোকটা পালিয়েছে।

বাণীদি—কখন্ পালালো ?

শৈলেশ—সেটা পুলিস জানে না, কিন্তু তুমি জান।

বাণীর মাথাটা হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়ে।

শৈলেশ—কথা বল। উত্তর দাও।

মুখ তোলে বাণী—কি বলবো ?

শৈলেশ—কখন্ পালালো লোকটা ?

বাণী—তা জানি না।

শৈলেশ—কখন্ পালিয়ে যেতে বলেছিলে তুমি ?

উত্তর দেয় না বাণী।

শৈলেশ—তুমি নিজে গিয়ে বলেছিলে ?

বাণী—না।

শৈলেশ—লোকটা নিজেই এসেছিল ?

—না।

—লোকটাকে তুমি ডেকে পাঠিয়েছিলে ?

—না।

—তবে ?

—বলে পাঠিয়েছিলাম।

—কা'কে পাঠিয়েছিলে ?

—বিমল অভয় আর···।

—তোমার সেই চারটে বকাটে আর আদুরে এজেণ্টকে ?

কথা বলে না বাণী।

—উত্তর দাও।

—কি ?

—তুমি কেন লোকটাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলে ?

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বাণী। বোধ হয় অন্য ঘরে চলে যেতে চায়। বাণীর দিকে ছ'পা এগিয়ে যেয়ে আরও শক্ত হয়ে দাঁড়ায় শৈলেশ।

বারান্দার অন্ধকারে ফিসফিস করে বিমল—দেখছিস অভয় ; শৈলেশদার হাতে একটা বেত।

অভয় বলে—চুপ।

শৈলেশ বলে—ঐ লোকটাকে পুলিসে দিলে তোমার কি ক্ষতি হতো ?

শৈলেশের মুখের দিকে শুধু অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে বাণী, কোন উত্তর দেয় না।

চেঁচিয়ে ওঠে শৈলেশ—কষ্ট হতো ?

বাণী—হতো।

দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলে শৈলেশ—কেন কষ্ট হতো ? লোকটা তোমার কে ?

বাণী—টিউটর।

শৈলেশ—তোমার শ্রদ্ধা?

বাণী—হ্যাঁ।

—তোমার কৃতজ্ঞতা?

—নিশ্চয়।

—তোমার মায়া?

—তাই।

শৈলেশের হাতের চকচকে বেতটা যেন একটা হিংস্র আক্রোশের বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে বাণীর মুখের উপর আছড়ে পড়ে।—বল, তোমার ভালবাসা?

বাণী বলে—হ্যাঁ।

বাইরের বারান্দার অন্ধকার যেন সেই মুহূর্তে পাল্টা হিংসার আনন্দে, প্রতিশোধের উল্লাসের মত হাততালি দিয়ে ফেলে। অভয়ের হাত চেপে ধরে বিমল—চুপ চুপ চুপ।

শৈলেশের হাতের বেত কাঁপতে থাকে।—হাততালি দিল কে? অভয় বোধহয়?

বাণীর বাঁ মুখের একটা দিকে, কপাল থেকে বাঁ চোখের পাশ দিয়ে গাল পর্যন্ত লম্বা একটা লাল্‌চে দাগ যেন ধিকধিক করে জ্বলছে। কিন্তু বাণীর মাথাটা একটুও কাঁপে না, মাথাটা হেঁটও করে না বাণী। আর চোখ দুটো যেন নির্বিকার নির্ভয় আর শান্ত দুটো অপলক চোখ।

শৈলেশের হাতের বেতটা মরা সাপের মত ঝুপ করে মেজের উপর পড়ে যায়। শৈলেশের কঠোর চেহারাটাও হঠাৎ একেবারে অলস হয়ে চেয়ারের উপর অসহায়ের মত বসে পড়ে।

দরজার দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে বাণী।

শৈলেশ—মুখের উপর ঐ দাগ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? সবাই যে দেখে ফেলবে?

বাণী—সবাই দেখুক, তুমি একা দেখবে কেন?

দরজার কাছে এসেই হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায় বাণী। যেন হোঁচট খেয়েছে বাণী। মুখ ফিরিয়ে তাকায়। ঠিকই, ভয়ানক একটা শব্দ করে শৈলেশের একটা অদ্ভুত নিঃশ্বাস বেজে উঠেছে।

ফিরে এসে শৈলেশের চেয়ারের কাছে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাণী। শৈলেশের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে; তার পরেই ঘরের শেল্‌ফের দিকে তাকিয়ে কি-যেন খুঁজতে থাকে বাণী।

বিমল বলে—দেখ দেখ অভয়, বাণীদি কি করছেন?

অভয়—কি আশ্চর্য, শৈলেশদাকে পাখার বাতাস দিচ্ছেন কেন বাণীদি?

বিমল—শৈলেশদার চোখ দুটো যে ছল-ছল করছে।

অভয়—হাততালি দেব আবার?

বিমল—থাক্, আর দরকার নেই।

অভয়—কিন্তু…।

বিমল—কি?

অভয়—বাণীদিকে কিন্তু চিনতেই পারা গেল না।